সমাজশিক্ষা প্রসঙ্গ

শ্রীমন্মথনাথ রায়

বাক্-সাহিত্য।
৩৩ কলেজ রো, কলিকাতা ৯

১লা ডিসেম্বর, সমাজশিক্ষা দিবস

প্রথম প্রকাশ—অগ্রহায়ণ, ১৩৭০

প্রকাশক : স্বপনকুমার মুখোপাধ্যায়

বাক্‌-সাহিত্য

৩৩ কলেজ রো

কলিকাতা-৯

মুদ্রক : মন্মথনাথ পান

কে. এম. প্রেস

১।১ দীনবন্ধু লেন

কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদপট : কানাই পাল

প্রচ্ছদপট মুদ্রণ :

মোহন প্রেস

ভূমিকা

আজ থেকে বছর পাঁচেক আগে সমাজশিক্ষার নানা প্রসঙ্গ আলোচনা করে 'সমাজশিক্ষা প্রসঙ্গ' নামে ক্ষুদ্র একখানি গ্রন্থ প্রণয়নের ইচ্ছা আমার মনে জাগে। সম্বল আমার সামান্য অধ্যয়ন আর সমাজ শিক্ষার কাজে কার্যকরী কিছু অভিজ্ঞতা। কোন কোন মহলের ধারণা, সহজ ভাষায় মনের কথা প্রকাশ করাব কৌশলও নাকি আমার মোটামুটি আয়ত্ত আছে। অপ্রকাশ্যে সেই অনিশ্চিত কৌশলটাকে ধরে নিয়েছিলাম তৃতীয় সম্বল হিসাবে। সময়ের অভাবে এবং আলস্যবশতঃ (অলস ব্যক্তিদের সময়ের অভাবই বড় অজুহাত) ইচ্ছাটাকে রূপায়িত করে তুলতে পারি নি এতোদিন। আজ পরিতৃপ্তির নিঃশ্বাস ছাড়ছি এই বলে—ক্ষুদ্রকায় এই গ্রন্থের মধ্য দিয়ে আমার সে ইচ্ছা সার্থক হলো।

সমাজশিক্ষা সম্বন্ধে বাংলা ভাষায় লেখা আরও গ্রন্থ রয়েছে। সেগুলোর উৎকর্য সম্বন্ধেও আমার কোন সন্দেহ নেই। তবে নানাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে এ ধরণের বাংলা ভাষায় লেখা কোন গ্রন্থ আছে কিনা আমার জানা নেই। আমার বিশ্বাস এ গ্রন্থ পাঠে শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং সাধারণ পাঠক সমাজশিক্ষা সম্বন্ধে মোটামুটি জ্ঞাতব্য বিষয়গুলো জানতে পারবেন। সকলের জন্য লিখেছি বলেই জটিলতর দু' একটি বিষয়ের অবতারণা বা আলোচনা আমি করিনি।

এই গ্রন্থ প্রণয়নে বহু সহকর্মী এবং সমধর্মী আমায় উৎসাহ এবং পরামর্শ দিয়েছেন। আমার তিনটি সম্বলের কথা বলেছি। এঁদের উৎসাহ এবং পরামর্শ আমার চতুর্থ সম্বল।

নবীন প্রকাশক বন্ধুপুত্র শ্রীমান স্বপনকুমার মুখোপাধ্যায় অসাধারণ তৎপরতা এবং নৈপুণ্য সহকারে তাঁর কাজ শেষ করেছেন। শ্রীমান স্বপন বাবাজীবনের সর্বাঙ্গীণ শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

যাঁদের জন্য আমার গ্রন্থ প্রণযন, গ্রন্থখানি তাঁদের এতটুকু কাজে লেগেছে জানলে শ্রমকুণ্ঠ লেখকের শ্রম সার্থক হবে। ইতি—

মন্মথনাথ রায়

১৭. ১০. ৬৩

দেবাইপুকুর রোড,

পোঃ ভদ্রকালী, হুগলী

বিষয়-সূচী

গ্রন্থকারের অন্যান্য গ্রন্থ ঃ

আমার দেখা ডেনমার্ক

(২য় সংস্করণ)

সমাজশিক্ষা প্রসঙ্গ

(এক)

সামাজিক শিক্ষা কি

মানুষকে সমাজে বাস করতে হয়। এটা তার পক্ষে অপরিহার্য। কোন একজন মানুষকে প্রচুর আহার্য, পরিধেয় বস্ত্র, ধন-দৌলত সঙ্গে দিয়ে যদি নির্জন দ্বীপে বসবাসের জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হয়, তবে দিন পরেই সে চিৎকার করে আকুল প্রার্থনা জানাবে—আমার অন্ন, বস্ত্র, ধন, দৌলত সব কিছু ফিরিয়ে নিয়ে যাও। বিনিময়ে মানুষের সঙ্গে বাস করার সুযোগ আমাকে দাও। তার এই প্রার্থনা অতি স্বাভাবিক। মানুষ স্বভাবতই সামাজিক জীব। অপর দশজনের সঙ্গে বাস করাই র স্বভাব। এই দশজনের সঙ্গ পরিত্যাগ করে সমাজের বাইরে গিয়ে বাস করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। কথা বলতে তার সঙ্গী চাই, খেলা করতে তার সঙ্গী চাই, কাজ করতে তার সঙ্গী চাই, বেঁচে থাকতেও তার সঙ্গী চাই। জীবনের বহু কাজই তাকে করতে হয় অপরের সঙ্গে। সংসার ত্যাগী সন্ন্যাসীর কথা আমরা শুনে থাকি। নির্জন বনে, গোপন গিরিগহ্বরে তাঁরা সাধনা করেন। মানুষের সাহচর্য তাঁদের কাছে প্রয়োজনহীন। এ ধরণের সংসার ত্যাগী সন্ন্যাসীর সংখ্যা অতি অল্প। তাঁরা অসাধারণ; তাঁরা নিয়মের ব্যতিক্রম। সাধারণ মানুষ সমাজেই বাস করে, সমাজের বাইরে তাদের অস্তিত্ব কল্পনা করা চলে না। গ্রীস দেশের বিখ্যাত পণ্ডিত অ্যারিস্টটল্ বলেছিলেন, যে নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করতে পারে, সে হয় দেবতা, না হয় পশু। মানুষ হলে ার পক্ষে সঙ্গীহীন হয়ে সমাজের বাইরে গিয়ে বাস করা অসম্ভব।

যে সকল শক্তির অস্তিত্ব হেতু মানুষ অপর প্রাণী অপেক্ষা মহত্তর, মানুষ মানুষপদবাচ্য, বাক্‌শক্তি তার অন্যতম। মানুষ কথার মাধ্যমে

নিজের মনের ভাব প্রকাশ করে। অন্য কোন প্রাণীর পক্ষে তা সম্ভব নয়। ভাব প্রকাশের জন্য অপর কোন ব্যক্তির উপস্থিতি অপরিহার্য। কেবল উন্মাদের পক্ষেই অপরের অনুপস্থিতিতে ভাষা ব্যবহার সম্ভব। সাধারণ মানুষের পক্ষে তা সম্ভব নয়। এ থেকে বুঝা যায় মানুষের এই শ্রেষ্ঠ শক্তিও অপরের সঙ্গের এবং পরোক্ষে সমাজের অস্তিত্বেরই কল্পনা করে।

মানুষের অন্তরের স্নেহ, মায়া-মমতা, ভালবাসা, সমবেদনা প্রভৃতি গুণকে আমরা প্রশংসা করে থাকি। এগুলোকে মানুষের বাঞ্ছনীয় সদ্‌গুণ বলে আমরা নিঃশঙ্কচিত্তে ঘোষণা করি। একাধিক ব্যক্তির সান্নিধ্য ব্যতিরেকে এই সকল গুণেরও অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। এক ব্যক্তি গুণের অধিকারী, অপর এক বা একাধিক ব্যক্তি তার পাত্র। কোন এক ব্যক্তি দয়ার অধিকারী হইলে অপর এক বা একাধিক ব্যক্তি সেই দয়ার পাত্র। নির্জন বনবাসীর মনে দয়া, মায়া-মমতা, ভালবাসা প্রভৃতি গুণ না থাকারই কথা ; থাকলেও সে গুণ প্রকাশ বা প্রসারের কোন সুযোগ পায় না। পরিবারে, গোষ্ঠীতে বা সমাজেই এ সকল গুণের প্রকাশ বা প্রসার সম্ভব। মানুষের সদ্‌গুণ নিচয় সমাজের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধের কথারই সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দেয়।

জীবনের অতি সাধারণ প্রয়োজন মিটাতে হলেও মানুষকে অপরের সাহায্য নিতে হয়। প্রতিদিনই মানুষের এই সকল সাধারণ প্রয়োজনের প্রকৃতি জটিল হয়ে চলেছে। সংখ্যাও বেড়ে চলেছে। এ অবস্থায় অপরের সহযোগিতার প্রয়োজনও বৃদ্ধি পেয়েছে। অপরের সাহায্য ব্যতিরেকে মানুষ তাদের অন্নবস্ত্রের প্রয়োজন মিটাতে পারে না, যানবাহনের প্রয়োজন মিটাতে পারে না। একে অপরের প্রয়োজন মিটাতে অগ্রসর হয় বলেই, মানুষের জীবন এত সুন্দর হয়েছে, এত সহজ হয়েছে। এ থেকেও এ কথা বুঝা যায় যে বেঁচে থাকার গরজেও মানুষের পক্ষে অপরের সঙ্গ, তথা সমাজ অপরিহার্য।

বাস্তবিক পক্ষে সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। সমগ্র দেহের সঙ্গে হস্তপদাদির যে সম্বন্ধ সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির সম্বন্ধও অনুরূপই বলা চলে। দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হলে হস্তপদাদি অঙ্গের নাম নিরর্থক হয়। কারণ ঐ বিচ্ছিন্ন অঙ্গ আপন নির্দিষ্ট কর্ম সম্পাদন করতে পারে না। মানুষ ও সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হলে তার নাম নিরর্থক হয়ে যায়। কেননা, যে সকল গুণের অস্তিত্বহেতু সে মানুষ পদবাচ্য, সে সকল গুণ তা থেকে লোপ পেয়ে যায়।

সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক নিবিড়। তাই সমাজের কল্যাণের সঙ্গে ব্যক্তির কল্যাণও জড়িত। সমাজের কল্যাণে ব্যক্তির কল্যাণ, আবার ব্যক্তির কল্যাণে সমাজের কল্যাণ। তাই কল্যাণকামী ব্যক্তিকে মনে রাখতে হয়, তার নিজের কল্যাণ সাধনের জন্য তাকে সমাজের কল্যাণ সাধন করতে হবে। আর কল্যাণকামী সমাজকে মনে রাখতে হয় ব্যক্তির কল্যাণেই সমাজের কল্যাণ। তাই সমাজকেও ব্যক্তির কল্যাণ সাধনে লিপ্ত হতে হয়।

পূর্বের এই আলোচনার পর আমরা নিশ্চিতরূপে মেনে নিতে পারি যে মানুষকে সমাজে বাস করতে হয়, এবং এই সমাজের কল্যাণের মধ্যে মানুষ আপন কল্যাণ খুঁজে পায়। কাজেই মানুষের কর্তব্য হল সুন্দরভাবে সমাজের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিয়ে সমাজের কল্যাণ সাধনে সচেষ্ট থাকা।

কতগুলো অভ্যাস প্রবৃত্তি, এবং গুণ আয়ত্ত করতে না পারলে, এবং কতগুলো বিষয় সম্বন্ধে অন্ততঃ সাধারণ জ্ঞান না থাকলে মানুষ সহজে এ কর্তব্য সম্পন্ন করতে পারে না। নিজেকে সুন্দরভাবে সমাজের সঙ্গে মানিয়ে নিতে হলে, সমাজের কল্যাণ সাধনে সচেষ্ট হতে হলে মানুষকে সৌজন্য, সহনশীলতা, সহানুভূতি, আনুগত্য, ত্যাগ প্রভৃতি প্রবৃত্তি বা গুণের অধিকারী হতে হয়। তাকে সমাজ কল্যাণের নানা উপায় জানতে হয়। যে সকল অভ্যাস, প্রবৃত্তি, গুণ এবং জ্ঞানের অধিকারী হলে মানুষের সমাজ জীবন যাপন সহজ ও সুগম হয়

সেগুলোর সমষ্টিকে টেক্সাস বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর হেন্‌রী অটো সমাজ-কুশলতা বা Social Competence বলে অভিহিত করেছেন। সমাজ কুশলতা আয়ত্ত করতে পারলে মানুষ আদর্শ সামাজিক জীবন যাপন করতে পারে।

সমাজ কুশলতা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি বা গুণ নয়। শিক্ষা এবং অনুশীলনের সাহায্যে সমাজ কুশলতা অর্জন করতে হয়। যে শিক্ষা পেলে মানুষ সহজে সমাজ কুশলী হতে পারে, আদর্শ সমাজ জীবন যাপন করতে পারে, সে শিক্ষার নাম হল সামাজিক শিক্ষা। এ শিক্ষা আদর্শ সামাজিক জীবন যাপনের শিক্ষা, পরোক্ষে সুষ্ঠু জীবন যাপনের শিক্ষা। এ শিক্ষার ফলে মানুষের সামাজিক অভ্যাস, আচরণ, প্রবৃত্তি এবং গুণ-গুলো সম্যক বিকশিত হবার সুযোগ পায়, এই কারণেই ডক্টর হেনরী অটো বলেছেন আজকের দিনের সমাজ শিক্ষার্থীদের মনে যে সকল সামাজিক প্রবৃত্তি, কুশলতা, আচরণ এবং জ্ঞানের বিকাশ কাম্য বলে মনে করে সেগুলো নিয়েই সামাজিক শিক্ষা। (Social Education consists of all the desired social attitudes, skills, knowledges and behaviours which today's society is seeking to engender in the educands.) এ শিক্ষা পেলে মানুষ একদিকে যেমন সমাজ জীবনকে সমৃদ্ধ করতে পারে, অপর দিকে নিজের জীবনকেও সার্থক করতে পারে।

সকল রকমের শিক্ষারই কিছুটা মানুষ পেয়ে থাকে তার পরিবেশ থেকে। বেশীর ভাগই মানুষ পেয়ে থাকে পরিকল্পিত এবং প্রবর্তিত উপায় থেকে। সামাজিক শিক্ষার ক্ষেত্রে-ও ঠিক অনুরূপ অবস্থা। সামাজিক শিক্ষারও কিছুটা মানুষ পেয়ে থাকে তার পরিবেশ থেকে। শৈশবে সে শিক্ষা মানুষ পায় তার পরিবারের পরিবেশে, খেলার মাঠে, বিদ্যালয়ের শ্রেণীকক্ষে। পরিণত বয়সে সে শিক্ষা মানুষ পেতে পারে নানা ক্ষেত্রে—সামাজিক অনুষ্ঠানে, সভাসমিতিতে, ধর্ম সম্মেলনে, ব্যবসা-বাণিজ্যের সূত্রে। বেশীর ভাগ শিক্ষাই মানুষকে পেতে হয়

পরিকল্পিত, প্রবর্তিত এবং আনুষ্ঠানিক পদ্ধতির মাধ্যমে নির্দিষ্ট শিক্ষা কেন্দ্রে।

সাধারণ শিক্ষা মানুষকে তার অন্তর্নিহিত শক্তি পূর্ণ বিকশিত করার সুযোগ দেয়। সে শিক্ষার সঙ্গে সামাজিক শিক্ষার বিন্দুমাত্র বিরোধ নেই। বর্তমান গণতান্ত্রিক সমাজের সাফল্য নির্ভর করে একদিকে নাগরিকদের স্বাধীন বুদ্ধিদীপ্ত সক্রিয় অংশ গ্রহণের উপর, অপর দিকে তাদের সমাজ চেতনার উপর। সামাজিক শিক্ষা সমাজের স্বার্থে আত্মবিলোপের নির্দেশ দেয় না। বরং সামাজিক চেতনার সঙ্গে বুদ্ধি-দীপ্ত ব্যক্তিত্ব বিকাশের সামঞ্জস্য বিধানের পথ নির্দেশ করে। মানুষ স্বাধীন মননশীলতা এবং ব্যক্তিত্বের অধিকারী না হলে সমাজের কল্যাণ সাধন তাহার পক্ষে অসম্ভব হয়। কাজেই সামাজিক শিক্ষা একদিকে যেমন মানুষকে সমাজ-সচেতন হতে নির্দেশ দেয়, অপর দিকে অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশ সাধনেও উৎসাহিত করে।

বিভিন্ন চিন্তাশীল ব্যক্তি সামাজিক শিক্ষার বিভিন্ন সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন। এ শিক্ষা যে উৎকৃষ্টতর সামাজিক জীবনের জন্য শিক্ষা একথা সকলেই স্বীকার করেছেন। বিভিন্ন কালের বা দেশের গরজে এর রূপ বিভিন্ন হতে পারে। কিন্তু এর উদ্দেশ্য হল মানুষকে সুষ্ঠু-নাগরিক জীবন যাপনের উপযোগী করে তোলা। এ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হলেই সামাজিক শিক্ষা সার্থক হবে, তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

(দুই)

সামাজিক শিক্ষার রূপ

মানুষকে আদর্শ সামাজিক জীবন যাপনের উপযোগী করে তোলাই সামাজিক শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। সামাজিক শিক্ষা পেয়ে মানুষ সমাজের বা রাষ্ট্রের উৎকৃষ্ট নাগরিক রূপে জীবন যাপন করে, অপরের কল্যাণের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করে, নিজের কল্যাণ সাধন করতে পারে। সামাজিক শিক্ষার রূপ এ উদ্দেশ্য দ্বারাই নির্ণীত হয়। সামাজিক শিক্ষার বিষয় সূচীতে এমন বিষয় স্থান পাবে, যা' অপরের সঙ্গে শান্তিপূর্ণভাবে বাস করে নিজের এবং সমাজের তথা সর্বশ্রেষ্ঠ সমাজ রাষ্ট্রের কল্যাণ সাধনে মানুষকে সহায়তা করে।

সমাজে বা রাষ্ট্রে অপরের সঙ্গে সুষ্ঠুভাবে বাস করতে হলে প্রত্যেক ব্যক্তিকে সম্যকরূপে উপলব্ধি করতে হবে তার সঙ্গে সমাজ বা রাষ্ট্রের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ রয়েছে। তার ভালমন্দ নানাভাবে সমাজের ভাল-মন্দের সঙ্গে জড়িত রয়েছে। এক কথায় বলা চলে প্রত্যেকের মনে সমাজ-চেতনা জাগা চাই। যখন কোন ব্যক্তি বুঝতে পারে যে সে সমাজের অংশ, সমাজের কল্যাণের সঙ্গে তার নিজের কল্যাণ জড়িত, তখন সে একদিকে যেমন নিজকার্য দ্বারা সমাজ জীবনের পুষ্টি সাধনে সচেষ্ট হবে, অপর দিকে সর্বতোভাবে আত্মোন্নতির প্রয়াস পাবে। এ কাজের জন্য প্রত্যেক ব্যক্তির জানা চাই সমাজ তার কাছে কি আশা করে, আবার সমাজের কাছ থেকে সে কি আশা করতে পারে অর্থাৎ কি তার কর্তব্য, কি তার অধিকার। সমাজে বহু ব্যক্তি একত্র বাস করে। কতগুলো নিয়ম সমাজে বা রাষ্ট্রে সকলে মেনে চলে বলেই এই ধরণের একত্র বাস সম্ভব হয়। সমাজের প্রতিটি ব্যক্তি যদি যদৃচ্ছ আচরণ করে তবে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় এবং সমাজজীবন অসম্ভব হয়। অথচ নিয়ম-কানুন মেনে চললেই

একত্র বাস সহজ হয়। রাস্তায় গাড়ী চলাচলের কথা একবার ভেবে দেখলেই একথাটা স্পষ্ট হয়ে যায়। গাড়ী চালকরা যদি নিজ নিজ ইচ্ছানুরূপ গাড়ী চালায়, তাহলে গাড়ীতে গাড়ীতে সংঘর্ষ অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠে। চলাচল অসম্ভব হয়। অথচ প্রত্যেক চালকই যদি নির্দিষ্ট পথে চলে এবং আরক্ষীর নির্দেশে গাড়ী থামায় তাহলে রাস্তায় নির্বিঘ্নে হাজার হাজার গাড়ী চলাচল করতে পারে। এ থেকে বুঝা যায় সমাজের সভ্য বা রাষ্ট্রের নাগরিক হিসাবে প্রত্যেকের কর্তব্য আইন শৃঙ্খলা মেনে চলা। তবেই সমাজে বা রাষ্ট্রে বহুলোকের একত্র বাস সম্ভব হয়।

এমনতর আরও অনেক কর্তব্য মানুষকে পালন করতে হয়। যদি তার সুনাগরিক হিসাবে জীবনযাপন করতে হয়, তাকে দেখতে হয় যেন সমাজের প্রতি তার মনে সকল সময় আনুগত্যের ভাব থাকে, সমাজের নির্দেশ যেন সে সর্ব সময়ে পালন করার জন্য প্রস্তুত থাকে। আমরা জানি রাষ্ট্র মানুষের কাছে অতি ব্যাপক এবং শক্তিমান সমাজ। প্রত্যেক মানুষের কর্তব্য রাষ্ট্র সংরক্ষণ এবং পরিচালনের জন্য সর্ব-প্রকার আর্থিক বা কায়িক ত্যাগ স্বীকার করা।

অপর দিকে সকল সার্থক নাগরিকই সমাজ বা রাষ্ট্রের কাছ থেকে কতগুলো অধিকার পেয়ে থাকে। সে অধিকার সে অপর নাগরিকের অনুরূপ অধিকার মেনে নিয়ে অপরের সঙ্গে সমান ভাবে ভোগ করে। সে স্বাধীন ভাবে চিন্তা করতে পারে, নিজের মত প্রকাশ করতে পারে। বাস্তবিক এর উপর সমাজের বা রাষ্ট্রের সাফল্য নির্ভর করে। সমাজ বা রাষ্ট্র তাকে অপরের আক্রমণ থেকে রক্ষা করবে, তার নিজস্ব সম্পত্তি ভোগ করার সুযোগ দিবে, শিক্ষালাভের এবং জীবিকা অর্জনের সুযোগ দিবে।

এভাবে দেখা যায় একত্র বাসের সুবিধার জন্য মানুষকে কতকগুলো কর্তব্য পালন করতে হয়। আবার সে কতকগুলো অধিকারও ভোগ করতে পারে। সামাজিক শিক্ষার প্রথম কাজ হল শিক্ষার্থীকে

তার কর্তব্য এবং দায়িত্ব সম্বন্ধে সজ্ঞান করে তোলা, তারপর তাকে যথাযথ দায়িত্ব পালনে বা অধিকার ভোগে উৎসাহিত করা, তার মধ্যে দায়িত্ব পালন বা অধিকার ভোগের অভ্যাস বা কুশলতা জাগ্রত করে দেওয়া।

ব্যক্তির জীবনের কল্যাণের একটি অতি অপরিহার্য উপাদান স্বাস্থ্য। সুস্থ দেহের অভ্যন্তরে বাস করে সুস্থ মন, বিরাজ করে অব্যাহত শান্তি। আবার এক ব্যক্তির স্বাস্থ্যের উপর নির্ভর করে তার প্রতিবেশী বা তার সহবাসীর স্বাস্থ্য। তার উপর আবার নির্ভর করে সমাজের শক্তি। একের অসতর্কতাবশতঃ অপরের স্বাস্থ্যহানি ঘটতে পারে। তার ফলে সমাজেরও অকল্যাণ হতে পারে। একের জ্ঞান এবং সতর্কতার ফলে নিজের এবং অপরের স্বাস্থ্য সংরক্ষণ সম্ভব হতে পারে। কোন নাগরিক নিজের অসতর্কতা বা অজ্ঞতাবশতঃ কলেরা রোগে আক্রান্ত হলে তার অসতর্কতা বা অজ্ঞতাবশতঃ কলেরা রোগে সমাজের অপর ব্যক্তি আক্রান্ত হতে পারে। আবার একের সতর্কতা এবং স্বাস্থ্য সংক্রান্ত জ্ঞানবশতঃ টীকার সাহায্যে বসন্ত রোগের আক্রমণ এবং বিস্তৃতি বন্ধ হতে পারে। তাতেই বুঝা যায় ব্যক্তি-স্বাস্থ্য সংরক্ষণের সঙ্গে গোষ্ঠী-স্বাস্থ্য সংরক্ষণ জড়িত। কাজেই কল্যাণকামী নাগরিকের ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য এবং গোষ্ঠীগত স্বাস্থ্য সংরক্ষণের নিয়ম জানা উচিত। এ সম্বন্ধে কেবল জ্ঞানই যথেষ্ট নয়। স্বাস্থ্য সংরক্ষণের নিয়মগুলো মেনে চলার অভ্যাস অর্জন করাও উচিত। আমাদের দেশের লক্ষ লক্ষ লোক অস্বাস্থ্যকর নোংরা পরিবেশে বাস করে নিজের এবং অপরের জীবন বিপন্ন করছে। অজ্ঞতা এবং অসতর্কতাবশতঃ কলেরা, বসন্ত, টাইফয়েড, যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগে হাজার হাজার লোক আক্রান্ত হচ্ছে। প্রসূতি সদনে বহু শিশু বা তাদের জননী মৃত্যুমুখে পতিত হচ্ছে। এরূপ রোগের আক্রমণ এবং অকালমৃত্যু রোধ করতে না পারলে সমাজেরও কল্যাণ নেই, ব্যক্তিরও কল্যাণ নেই। একটা শক্তিশালী সমাজ গড়ে তুলে তারই

যোগ্য অংশীদার হয়ে বাস করতে হলে নাগরিকদের ব্যক্তিগত এবং সামাজিক স্বাস্থ্য-বিধির জ্ঞান থাকা চাই, সেগুলো পালন করার অভ্যাস থাকা চাই। তাই সামাজিক শিক্ষার দ্বিতীয় কর্মসূচী হলো স্বাস্থ্য সম্বন্ধে জ্ঞান দান করা এবং স্বাস্থ্য বিধি মেনে চলার অভ্যাস সৃষ্টি করা।

মানুষকে পরিশ্রম করে জীবিকা অর্জন করতে হয়। কোন ব্যক্তিকে অধিক পরিশ্রম করতে হয়, কোন ব্যক্তিকে কম পরিশ্রম করতে হয়। প্রকৃতপক্ষে জীবিকার জন্য পরিশ্রম সকলকেই করতে হয়। সারা দিন পরিশ্রম করা সম্ভব নয়। পরিশ্রমের পর বিশ্রামের প্রয়োজন হয়। বিশ্রামই আবার মানুষকে পরিশ্রমের জন্য শক্তি দেয়। নানা ধরণের বৈজ্ঞানিক উন্নতির ফলে বর্তমান যুগে মানুষের অবসরের সময় বৃদ্ধি পেয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে অবসর বিনোদনের উপায় নিয়েও সমস্যা বেড়ে চলেছে। কখনও কখনও দেখতে পাওয়া যায় মানুষ এমন ভাবে তার অবসর সময় কাটাচ্ছে, যার ফলে তার নিজের, তার পরিবারের এবং সমাজের জীবন বিপন্ন হচ্ছে। একটু লক্ষ্য করলেই আমরা দেখতে পাই, কলকারখানার সাধারণ শ্রমিকরা কিভাবে নিম্নস্তরের আমোদ আহ্লাদে পানাহারে অবসর সময় কাটিয়ে দেয়। তাতে তাদের নিজেদের শরীর ও মনের প্রভূত ক্ষতি সাধন হয়। তাদের পারিবারিক জীবন অশান্তিপূর্ণ হয়। তাদের কার্যকলাপে সমাজ-জীবন বিপন্ন হয়।

অপর দিকে আমরা দেখতে পাই যথার্থ শিক্ষিত ব্যক্তিরা কেমন খেলাধূলা, নৃত্য, গীত, অভিনয়, অনুষ্ঠানাদির মাধ্যমে তাদের অবসর বিনোদন করছে। তাদের কার্যকলাপে পরিবারের বা সমাজের অপর ব্যক্তিরা অংশ গ্রহণ করছে। তারাও অবসর বিনোদন করছে। সঙ্গে সঙ্গে তারা শিক্ষা লাভও করছে। এভাবে দেখা যায় ব্যক্তির অবসর বিনোদন সংক্রান্ত কার্যকলাপ প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ভাবে সমাজের উপর প্রভাব বিস্তার করে। সমাজের কল্যাণ বা অকল্যাণ সাধন

করে। তাই যারা সুন্দর ভাবে সমাজে বাস করে সমাজের তথা নিজের কল্যাণ সাধন করতে চায় তাদের অবসর বিনোদনের উৎকৃষ্ট উপায়গুলো সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান এবং অভ্যাস থাকা প্রয়োজন। তাদের সে ভাবে অবসর বিনোদনের কুশলতা আয়ত্ত করা প্রয়োজন। তবে নিজের জীবনও সুন্দর হয়, সমাজের জীবনও সুন্দর হয়। মানুষকে আদর্শ নাগরিক জীবন যাপন করার শিক্ষা ব্যবস্থায় কাজেই অবসর বিনোদনের উপায় সম্বন্ধে জ্ঞান এবং কুশলতা স্থান পাবে। তাই সামাজিক শিক্ষার তৃতীয় কর্মসূচী হবে খেলা-ধূলা, নৃত্য-গীত, যাত্রা, কবি, কীর্তন, কথকতা প্রভৃতি শিক্ষামূলক এবং কৃষ্টিমূলক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অবসর বিনোদনের উপায়ের নির্দেশ দেওয়া এবং অভ্যাস সৃষ্টি করা। এতে যে সমাজ কেবল বিপত্তির হাত থেকে রক্ষা পাবে তা নয়। এরই মাধ্যমে সাধারণ লোকেরা শিক্ষাও পাবে, সকলে দেশের কৃষ্টি এবং ঐতিহ্যকে ধরে রাখতে পারবে। সুনিয়ন্ত্রিত-ভাবে পরিচালিত হলে এ সকল অনুষ্ঠান মানুষের মনে দেশের প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি করবে।

তাই সামাজিক শিক্ষার তৃতীয় কাজ হল নির্দোষ আনন্দের মাধ্যমে শিক্ষামূলক উপায়ে অবসর বিনোদনের উপায় নির্দেশ করা এবং শিক্ষার্থীর মনে সে আকাঙ্ক্ষা এবং অভ্যাস জাগিয়ে দেওয়া।

বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় মানুষের জীবনে অর্থের প্রয়োজন অপরিহার্য। ব্যক্তির বা সমাজের উন্নতির মূলে হলো অর্থ। ব্যক্তি তথা সমাজের উন্নতি নির্ণীত হয় অর্থের দ্বারা। যে সমাজের অধিকাংশ লোক অভাব অনটনে কাল কাটায় সে সমাজের কি শিক্ষা, কি স্বাস্থ্য, কি কৃষ্টি, কি শিক্ষা কোন কিছুরই উন্নতি সম্ভব নয়। একজন দরিদ্র লোককে গোটা দিন তার অন্নবস্ত্র সংস্থানের চিন্তায় বা চেষ্টায় অতিবাহিত করতে হয়। নিজেকে নিয়ে বিব্রত প্রায়-আত্মসমাহিত সেই ব্যক্তির কাছে সমাজ নিরর্থক। সে স্বভাবতই সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। জীবন তার অস্বাভাবিক হয়ে যায়, দুর্বহ বলে মনে হয়।

জীবন যাপনের পক্ষে যে সমাজ অপরিহার্য, তার কাছে সে সমাজের বন্ধনও শিথিল হয়ে যায়।

এর অন্য আর একটি দিকও রয়েছে। যে সমাজে মাত্র অল্প কয়েকজন ব্যক্তি বিত্তবান, সে সমাজের বিত্তবিহীন ব্যক্তিরা ধীরে ধীরে ঐ বিত্তবান ব্যক্তিদের উপর বিদ্বেষভাবাপন্ন হয়ে উঠে। তারপর এই বিদ্বেষকে কেন্দ্র করেই সমাজে ভাঙন দেখা দেয়।

মানুষের সামাজিক জীবনের সুস্থতার জন্য তাই চাই ব্যক্তির আর্থিক উন্নতি। কাজেই সামাজিক শিক্ষার মধ্যে আর্থিক উন্নতির পন্থা নির্ণয়ের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। ব্যাপকভাবে এ ব্যবস্থা করা সামাজিক শিক্ষার পক্ষে সম্ভব নয়। তথাপি সামাজিক শিক্ষা মানুষকে তার আর্থিক অবস্থার উন্নতি বিধানে উৎসাহিত করতে পারে এবং অন্ততঃ সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে পথ নির্দেশ করতে পারে। কোন প্রথায় চাষ করলে ফসল বৃদ্ধি পাবে, কুটির শিল্পে স্বল্প ব্যয়ে কি করে অধিক উৎপাদন করা যাবে, সমবায় পদ্ধতিতে কি করে মুলধন সংগ্রহ করা যাবে, এ সব সম্বন্ধে জ্ঞান পরিবেশন করা সামাজিক শিক্ষা ব্যবস্থার পক্ষে কঠিন নয়। সহজ কারিগরী শিক্ষার ব্যবস্থাও এতে থাকা চলে। ইয়োরোপের কোন কোন দেশে সামাজিক শিক্ষা-কেন্দ্রে কৃষি ও অন্যান্য শিল্প নিয়মিত ভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়। এতে লোকেরা আর্থিক অবস্থার উন্নতি বিধানের উপায় আয়ত্ত করতে পারে। সমাজের ভিত্তিও দৃঢ় হয়। সামাজিক শিক্ষার চতুর্থ কাজ হলো তাই শিক্ষার্থীদের আর্থিক উন্নতির পথ নির্দেশ করা এবং আর্থিক উন্নতির প্রচেষ্টাকে উৎসাহিত এবং পরিপুষ্ট করা।

মানুষের দেশ বা রাষ্ট্রের বাইরেও একটা বিশাল সমাজ আছে। গোটা বিশ্ব মানব সমাজের প্রত্যেক মানুষই সেই বিশ্বমানব সমাজের সভ্য। নানা উন্নতির ফলে আজ বিশ্ব মানুষের কাছে ক্ষুদ্রতর হয়ে গেছে। বিশ্বের এক কোণের মানুষের কার্যকলাপ আজ সহজে অপর কোণের মানুষের উপর প্রভাব বিস্তার করছে। এক অংশের মানুষ

অপর এক অংশের মানুষের কাছে আজ সহজে পরিচিত। কেবল পরিচিত নয় আত্মীয়ও বটে। মানুষের মনে আজ সেই ব্যাপকতর সামাজিক চেতনা জাগিয়ে দেওয়া প্রয়োজন। সমগ্র মানব জাতির কল্যাণ, শান্তি নির্ভর করে তার উপর। সামাজিক শিক্ষার পঞ্চম কাজ হলো মানুষের মনে বিশ্বনাগরিকতা বোধ জাগ্রত করা।

ভারতের মত শিক্ষায় অনগ্রসর দেশগুলোতে বহু নিরক্ষর বয়স্ক ব্যক্তি রয়েছে। যারা লেখাপড়া জানে তারা নাগরিক হিসাবে প্রয়োজনীয় জ্ঞাতব্য বিষয়গুলো বিভিন্ন গ্রন্থ, সংবাদপত্র পাঠে জানতে পারে। কিন্তু যে দেশে বহু লোক নিরক্ষর সে দেশের লোকদের পক্ষে এ সকল জ্ঞাতব্য বিষয় জানা দুরূহ কাজ। শুধু তাই নয়। এরা অন্ধকারে হতভাগ্য জীবন যাপন করে। গৃহ কোণই তাদের বিশ্ব। বৃহত্তর বিশ্বের দ্বার তাদের কাছে রুদ্ধ। এদের জীবন যাত্রা পরোক্ষে সমাজ জীবনের পরিপন্থী। এদের অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন করে তুললে এরা নাগরিক জীবন যাপনের উপযোগী তথ্যগুলো নিজেরাই সংগ্রহ করে নিতে পারবে। তাছাড়া বিশ্বের নানা তথ্য বা রহস্য সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করে এরা নিজের জীবনকে মাধুর্যপূর্ণ করে তুলতে পারবে। তাই শিক্ষায় অনগ্রসর দেশে সামাজিক শিক্ষার অন্যতম কাজ হলো নিরক্ষর ব্যক্তিকে সাক্ষরতা দান।

(একটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন। নিরক্ষরতা দূরীকবণ সামাজিক শিক্ষার উদ্দেশ্য নয়, উপায় মাত্র। অবশ্য এটা প্রধান উপায়। এই প্রসঙ্গে স্বাধীন ভারতের প্রথম শিক্ষামন্ত্রী মৌলানা আজাদের উক্তি অনুধাবনযোগ্য সন্দেহ নেই। তিনি বলেছেন, ‘মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশ সাধনই সামাজিক শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।) নিরক্ষতা দূরীকরণ ইহার অন্যতম প্রধান উপায়। নিরক্ষরতা দূর করে প্রতিটি মানুষকে তাঁর পারিপার্শ্বিক জগৎ সম্বন্ধে সচেতন করে তুলতে হবে। শিক্ষা তাকে তার পরিবেশের পূর্ণ সুযোগ ও সুবিধা গ্রহণে সাহায্য করবে। উন্নত ও বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে কৃষি এবং অন্যান্য শিল্পের ক্রমোন্নতি সাধনের

ফলে তার আর্থিক অবস্থার উন্নতি সাধিত হবে। স্বাস্থ্য, বিদ্যা ও স্বাস্থ্য-বিধির অনুশীলনের ফলে তার ব্যক্তিগত, নাগরিক ও সামাজিক জীবন হবে সুস্থ ও আনন্দময়। সর্বোপরি শিক্ষার কল্যাণে প্রত্যেক দেশবাসী দেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতির সঙ্গে সুপরিচিত হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে তার মনে নাগরিক হিসাবে তার অধিকার ও সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি তার কর্তব্য ও দায়িত্ববোধ জেগে উঠবে। সামাজিক শিক্ষা তাকে বৃহত্তর জগতের এবং নিজ রাষ্ট্রের একজন যোগ্য নাগরিকরূপে গড়ে তুলবে।

(তিন)

সামাজিক শিক্ষার পৃথক ব্যবস্থা কেন

সামাজিক শিক্ষার স্বরূপ আলোচনা প্রসঙ্গে সামাজিক শিক্ষার শিক্ষনীয় বিষয়গুলো সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। সে আলোচনায় আদর্শ সামাজিক জীবন যাপনের জন্য যা অধিগত বা আয়ত্ত করা প্রয়োজন বলে নির্দিষ্ট হয়েছে তা সকল দেশের শিক্ষার্থীরাই প্রচলিত মাধ্যমিক শিক্ষার মাধ্যমে জানতে বা আয়ত্ত করতে পারে। অনেক জ্ঞাতব্য বিষয়ই পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত থাকে। শিক্ষার্থীরা নিজেদের পাঠ প্রস্তুত করার সময়ই সেগুলো আয়ত্ত করে। তা ছাড়া বিদ্যালয়ের শ্রেণীকক্ষে, নানা অনুষ্ঠানে বা উৎসবে পরস্পরের সঙ্গে মেলামেশার মধ্যদিয়েও শিক্ষার্থীরা আদর্শ সমাজ জীবন যাপনের শিক্ষা পায়। কাজেই মোটামুটি কোন দেশের মাধ্যমিক মান পর্যন্ত যারা অধ্যয়ন শেষ করতে পারে, তারা তাদের সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক শিক্ষাও পেতে পারে, একথা ধরে দেওয়া নিতান্ত অসঙ্গত হবে না। সমাজের গরজ সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কিছুটা বদলে যায়। এই বদলে যাওয়া গরজের সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নেওয়ার জন্য নাগরিকদের নতুন কিছু শিখতে বা আয়ত্ত করতে হয়। তাহলেও যারা মাধ্যমিক মান পর্যন্ত পাঠ শেষ করেছে, তারা পড়েশুনেই নতুন বিষয় জেনে নিতে বা আয়ত্ত করতে পারে। কাজেই নির্দিষ্ট মান পর্যন্ত সাধারণ শিক্ষা যারা পেয়েছে, তাদের জন্য পৃথকভাবে সামাজিক শিক্ষার কোন ব্যবস্থার প্রয়োজন হয় না।

কখনও দেখা যায় যারা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করেছে বা অন্যভাবে উচ্চ শিক্ষা লাভ করেছে তাদের মধ্যে দু'একজন নাগরিকদের অতি সাধারণ করণীয় কাজ করতে বা কর্তব্য পালন করতে ভুলে যায়

বা কুণ্ঠা বোধ করে। রেলের প্রথম শ্রেণীর যাত্রীরা সাধারণত উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তি। এদের মধ্যেও দু'একজনকে দেখা যায়, একদিকের আসনে উপবেশন করে সম্মুখের আসনটার উপর ধুলি-কাদা-মাখা পাদুকা সমেত পা-দুখানি ছড়িয়ে আছেন। এঁরা অপরের অসুবিধার কথা একবারও মনে ভাবেন না। সাধারণ সামাজিক আচরণের প্রতি যে নিষ্ঠা একজন শিক্ষিত ব্যক্তির থাকা প্রয়োজন তাকে এঁরা অকুণ্ঠচিত্তে বিসর্জন দিয়েছেন। এ ধরনের দু'একজন শিক্ষিত ব্যক্তিকে আবার কখনও দেখা যায় কোন একটা নির্বাচনের সময় নির্লজ্জভাবে অবৈধ পদ্ধতি অবলম্বন করতে বা তা সমর্থন করতে। এ সকল লোকের সাধারণ শিক্ষা অন্ততঃ এদিক থেকে নিরর্থক হয়েছে। পৃথক করে এদের জন্য সামাজিক শিক্ষার ব্যবস্থা করলেও তা এদের হয়ত ব্যর্থ হবে। সমাজে এ ধরনের শিক্ষিত ব্যক্তির সংখ্যা কম। এটাই হচ্ছে সান্ত্বনার কথা।

মাধ্যমিক মান পর্যন্ত শিক্ষা সমাপনকারীদের বাদ দিয়ে অবশিষ্ট নাগরিকদের আমরা আমাদের উদ্দেশ্যে দু'শ্রেণীতে ভাগ করতে পারি প্রথম শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত করা যায় তাদের যারা লেখাপড়া শিখেছে অথচ মাধ্যমিক মান পর্যন্ত লেখাপড়া শেষ করে নি। এদের সংখ্যা নিতান্ত নগন্য নয়। যে সকল দেশে বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রচলিত হয়েছে, সে সকল দেশে সাধারণতঃ প্রাথমিক শিক্ষাকেই বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এসকল দেশের শিক্ষার্থীদের অধিকাংশই প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনান্তে কৃষি, শিল্প প্রভৃতি নানা বৃত্তিতে নিযুক্ত হয়েছে। দ্বিতীয় শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত করা যায় তাদের, যারা লেখাপড়া মোটেই করেনি। জাপান, যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশে এধরনের লোকের সংখ্যা কম। কিন্তু ভারতের মত শিক্ষায় অনগ্রসর দেশগুলিতে এধরনের লোকের সংখ্যা খুব বেশী। শিক্ষায় অনগ্রসর কয়েকটি দেশের নিরক্ষতার শতকরা হার হল নিম্নরূপঃ—

দেশ	বৎসর	নিরক্ষরতার শতকরা হার
ব্রহ্মদেশ	১৯৫৩	৩০'১
সিংহল	১৯৪৬	৩৭'০
তুরস্ক	১৯৫০	৬৮'১
ভারত	১৯৬১	৭৬'০
ইজিপ্ট	১৯৪৭	৮০'১

গোটা পৃথিবীর মোট লোক সংখ্যার শতকরা ৪৩'৫৪ ভাগ হল নিরক্ষর। আমাদের ভারতের নিরক্ষর ব্যক্তির সংখ্যা কিঞ্চিদধিক তেত্রিশ কোটি। আর পশ্চিম বঙ্গের নিরক্ষরের সংখ্যা মোট দু'কোটি চল্লিশ লক্ষ। এদের মধ্যে অবশ্য অন্ততঃ এক তৃতীয়াংশ চৌদ্দ পনের বৎসর অপেক্ষা কম বয়সের শিশু, যারা হয়ত বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করছে বা যাদের বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের সম্ভাবনা আছে। এ হিসাব মতেই দেখা যায় কেবল পশ্চিম বঙ্গেই এক কোটি ষোল লক্ষ, এবং ভারতে মোট বাইশ কোটি লোক রয়েছে যারা বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেনি এবং যাদের বিদ্যালয়ে সাধারণ শিক্ষালাভের কোন সম্ভাবনাও নেই।

উপরে বর্ণিত এই দুই শ্রেণীর লোকেরা সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে সামাজিক শিক্ষা পায়নি। অপরের সঙ্গে আচার আচরণের মধ্য দিয়ে সামাজিক উৎসব অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এরা কিছুটা সামাজিক শিক্ষা হয়ত বা পেয়েছে। কিন্তু সে শিক্ষা অসম্পূর্ণ, আদর্শ সামাজিক জীবন যাপনের পক্ষে আকাঙ্খৎকর। উপরের হিসাব থেকে এটা বোঝা যায় যে এই দুই শ্রেণীর লোকের সংখ্যা ভারতের মত অনগ্রসর দেশে অত্যন্ত বেশী। এদের আদর্শ সামাজিক জীবন যাপন করার সুযোগ দিতে হলে, এদের জন্য পৃথক ভাবে সামাজিক শিক্ষার ব্যবস্থা করতেই হয়। সামাজিক শিক্ষার ধারা দেশের প্রয়োজন বা সামর্থ্যানুযায়ী পৃথক হতে পারে। যে দেশে অধিক লোক নিরক্ষর সে দেশের সামাজিক শিক্ষা ব্যবস্থায়

নিরক্ষরতা দূরীকরণ গুরুত্ব লাভ করবে। আবার যে দেশে নিরক্ষরতার বালাই নেই, সে দেশের ব্যবস্থায় কৃষ্টিমূলক শিক্ষা বেশী প্রাধান্য লাভ করবে। যে দেশে অর্থের প্রাচুর্য রয়েছে সেখানে পৃথক পৃথক কার্যসূচীর জন্য পৃথক পৃথক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হবে। আবার যেখানে অর্থের অনটন সেখানে একই প্রতিষ্ঠানে নানা কর্মসূচী অনুসৃত হবে। ব্যবস্থা এক হোক আর পৃথক হোক প্রয়োজন অনস্বীকার্য।

আমাদের দেশে অন্ততঃ দুটি কারণে সামাজিক শিক্ষার জন্য পৃথক ব্যবস্থা করতে হয়। আগেই বলা হয়েছে, এদেশে মোট তেত্রিশ কোটি লোক নিরক্ষর। এই তেত্রিশ কোটি 'নরনারীর নিকট মানস-জগত চিরকালের মত অবরুদ্ধ হয়ে রয়েছে। এদের নিকট জ্ঞানের দ্বার জন্মজন্মান্তরের মত রুদ্ধ। এদের জীবন হলো একটি কারাগৃহ যার দেয়ালগুলো রূঢ় বাস্তবের মত কঠোর, আর যা থেকে আত্মার মুক্তি লাভের জন্য কোন পথ উন্মুক্ত নেই। এইসব অশিক্ষিত নরনারী অতিশয় শুষ্ক ও নীরস জীবন যাপন করে। এদের জীবনে মুক্তির আস্বাদ নেই, কোন জিনিষ গড়ে তোলার স্পৃহা নেই। এদের জীবনে আনন্দ নেই, তৃপ্তি নেই, শান্তি নেই।' এই বঞ্চিত নরনারী শিক্ষা পেলে এদের মানসজগত প্রসারিত হতে পারে, এরা মুক্তির আস্বাদ পেতে পারে। অন্ধকারাচ্ছন্ন জগৎটাকে পাশ্চাতে রেখে এরা আলোর পথের যাত্রা শুরু করতে পারে। এদের সে শিক্ষা সাধারণ শিক্ষা নয়। সাধারণ শিক্ষার বয়ঃসীমা তারা অতিক্রম করেছে। এদের জন্য পৃথক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। কেবল নিরক্ষরতা দূরীকরণের শিক্ষা এদের সম্পূর্ণ প্রয়োজন মিটাতে পারবে না। পৃথক ভাবে কৃষ্টিমূলক সামাজিক শিক্ষার ব্যবস্থাও এদের প্রয়োজন।

স্বাধীন ভারতে গণতান্ত্রিক সমাজ প্রবর্তিত হয়েছে। জনগণের স্বার্থে জনগণের দ্বারা পরিচালিত জনগণের শাসনই হলো গণতান্ত্রিক

শাসন। এ ব্যবস্থায় জনগণের দ্বারাই জনগণ শাসিত হচ্ছে জনগণের কল্যাণে। এর সাফল্য নির্ভর করে সকল ব্যক্তির বুদ্ধিদীপ্ত অংশ গ্রহণের উপর। এ পদ্ধতি চায় প্রত্যেকটি লোক যেন রাষ্ট্রের সকল কাজে আদর্শ কর্মী হিসাবে বুদ্ধিমত্তা প্রদর্শন করে যোগদান করে। যত অধিক সংখ্যক লোক দেশের কথা চিন্তা করবে, দেশের কাজে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করবে, নিজের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন থাকবে, গণতন্ত্র ততই সফল হবে। অপরদিকে জ্ঞানহীন কর্মবিমুখ নিরুৎসাহ নাগরিক গণতান্ত্রিক স্বার্থের প্রতিকূল। এরা গণতন্ত্রের দুর্বলতার উৎস। স্বার্থান্বেষী নেতাদের হাতের ক্রীড়নক হয়ে এরা এমন কাজ করতে পারে, যার ফলে গণতন্ত্র প্রহসনে পরিণত হতে পারে। ভারতের গণতন্ত্র পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ গণতন্ত্র। এই গণতন্ত্র বুদ্ধিহীন সমাজচেতনাহীন মূল্যজ্ঞানহীন নাগরিক দ্বারা পরিচালিত হতে পারে না। তাহলে ধীরে ধীরে এমন একটা দুর্বলতা রাষ্ট্রকে পেয়ে বসবে, যার ফলে অচিরে এই কষ্টার্জিত স্বাধীনতা নির্বুদ্ধি লোকেদের কার্যকলাপের ফলে বিফল হয়ে যাবে।

এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সামাজিক শিক্ষার পৃথক ব্যবস্থা ছাড়া আমাদের ভারতে গত্যন্তর নেই। দেশের অগণিত জনসাধারণকে তাদের দায়িত্ব পালনের এবং অধিকার ভোগের শিক্ষা দিতে হবে। এদের দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করে তুলতে হবে। দেশের ঐতিহ্যের প্রতি, কল্যাণের প্রতি আকৃষ্ট করতে হবে। তাহলেই গণতন্ত্র সফল হবে।

দেশের অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কখনও কখনও সামাজিক শিক্ষার জন্য কেবল পৃথক নয়, বিশেষ ব্যবস্থাও করতে হয়। দেশে জরুরী অবস্থা দেখা দিলে কখনও কখনও নাগরিকদের কর্তব্য বেড়ে যায়, অধিকার ক্ষুন্ন হয়ে যায়। চীন অতর্কিতে ভারত আক্রমণ করার ফলে ভারতে তেমনই একটি জরুরী অবস্থার সৃষ্টি হল। স্বভাবতই নাগরিকদের করণীয় কাজ অনেক বেড়ে গেল, আর কোন কোন ক্ষেত্রে অধিকার ও খানিকটা ক্ষুন্ন হল। এ অবস্থায় আমাদের

মত দেশে সামাজিক শিক্ষার মাধ্যমেই লোকেদের এসব সম্বন্ধে সচেতন করে তুলতে হবে। তাদের দায়িত্ব পালনে উৎসাহিত করতে হবে। এসব ক্ষেত্রে কেবল পৃথক ব্যবস্থা নয়, বিশেষ ব্যবস্থাও করতে হয়। সমাজশিক্ষার কার্যসূচীতে বিশেষ অধ্যায়ও যোজনা করতে হয়।

(চার)

বয়স্কশিক্ষা বনাম সামাজিক শিক্ষা

সারা বিশ্বে শতকরা মোট ৪৩·৫৪ জন লোক নিরক্ষর। হার সকল দেশে সমান নয়। এদের সংখ্যা কোন দেশে খুব বেশী আবার কোন দেশে কম। এরা বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করার সুযোগ পায়নি বা গ্রহণ করে নি। পৃথিবীর বুকে বিচরণ করেও এরা পৃথিবীর খবর কিছু রাখে না। জ্ঞানের দুয়ার এদের কাছে রুদ্ধ। এদের কাছে এদের নিকটতম প্রতিবেশীও অপরিচিত। মানব জীবনের সৌন্দর্য, মাধুর্য, বৈচিত্র্য এদের নিকট অপরিজ্ঞাত। শিক্ষার গুরুত্বের কথা বলতে গিয়ে পণ্ডিত জোয়াড বলেছেন, শিক্ষা এবং অনুশীলনের ফলে যার রুচি এবং মন উন্নত হয়, তার কাছে পৃথিবী বৃহত্তর, ব্যাপকতর এবং অধিকতর রোমাঞ্চকর বলে প্রতিভাত হয়। সে ব্যক্তি পৃথিবীতে অধিকতর সৌন্দর্যের উপাদান, অধিকতর বৈচিত্র্য এবং সমবেদনা-বোধের বৃহত্তর পরিবেশের সন্ধান পায়। তার মনে বিশ্ব এবং মানব প্রকৃতি সম্বন্ধে অধিকতর স্পষ্ট উপলব্ধি জাগ্রত হয়। যারা শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত তারা জীবনের এই সকল বিচিত্র সম্পদ এবং অধিকার হতেও বঞ্চিত। জীবন ধারণ তাদের সত্যই বিড়ম্বনা। কষ্ট-ক্লিষ্ট প্রাণ তাদের কোন রকমে বাঁচিয়ে রাখা।

সকল দেশে এমন লোকও অনেক রয়েছে যারা বিদ্যালয়ে বাধ্য হয়ে বা স্বেচ্ছায় সামান্যতম শিক্ষা লাভ করে আর অগ্রসর হতে পারেনি। তারা পরবর্তীকালে কলকারখানায় ক্ষেত খামারের কাজে নিযুক্ত হয়েছে। অনুশীলনের সুযোগের অভাবে এদের অর্জিত বিদ্যা প্রায় নিষ্ফল হয়ে গেছে। চর্চার একটু সুযোগ পেলে এরা নিজের চেষ্টায়ই জ্ঞাতব্য অনেক কিছুই জেনে নিতে পারত। শিক্ষকের সামান্যতম নির্দেশ বা পরামর্শ সময় সময় পেলে এরা অনেক কিছু

জেনে জানার আনন্দ উপলব্ধি করতে পারত। কিন্তু বহু ক্ষেত্রেই দেখা যায় চর্চার অভাবে এদের শিক্ষা এমন অকেজো হয়ে যায় যে এরা শেষ পর্যন্ত নিরক্ষরদের পর্যায়ে নেমে আসে।

বর্তমান যুগে যারা শিক্ষা পেতে চায় তাদের জীবনভর প্রায় বিরামহীন শিক্ষাদানের দায়িত্ব সকল গণতন্ত্রই স্বীকার করে নিয়েছে। সকল বয়সের নাগরিকগণেরই রাষ্ট্রের এবং নিজের প্রয়োজন মত শিক্ষালাভের অধিকার আছে। কাকেও শিক্ষার আলোক থেকে বঞ্চিত রাখার কোন অধিকার কোন রাষ্ট্রেরই নাই। যারা নিরক্ষর বয়স্ক রয়েছে বা যারা স্বল্পশিক্ষিত বয়স্ক রয়েছে, তাদের শিক্ষা দানের দায়িত্ব রাষ্ট্রের সাধারণ শিক্ষাদানের বৃহত্তর দায়িত্বেরই অংশ। এ ধরণের নিরক্ষর বা স্বল্পশিক্ষিত লোকেদের শিক্ষাদানের জন্য বিভিন্ন দেশে যে ব্যবস্থা হয়ে থাকে সে ব্যবস্থাকে বলা হয় বয়স্ক শিক্ষা।

বয়স্ক শিক্ষা ব্যবস্থাতে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন কর্মসূচী অনুসৃত হয়। দেশের শিক্ষার অবস্থা এবং প্রয়োজনীয়তার উপর নির্ভর করে এই কর্মসূচী। ভারতের মত যে দেশে নিরক্ষর লোকের সংখ্যা খুব বেশী সে দেশে বয়স্ক শিক্ষার প্রথম এবং প্রধান কাজ হবে নিরক্ষরতা দূরীকরণ। আবার জাপানের মত দেশে নিরক্ষরের সংখ্যা শতকরা তিনেরও কম। সেখানকার বয়স্ক শিক্ষার কর্মসূচীতে নিরক্ষরতা দূরীকরণ হয়ত স্থানই পায় না। সে দেশের বয়স্ক শিক্ষায় কারিগরী শিক্ষার বা সাংস্কৃতিক শিক্ষার স্থান বিশিষ্ট। ডেনমার্ক, সুইডেন প্রভৃতি দেশে বয়স্ক শিক্ষার ব্যবস্থা খুব সুষ্ঠু এবং ব্যাপক। বয়স্কশিক্ষাধীন শিক্ষার্থীরা এখানে কোথাও দেশের ভাষা, ইতিহাস, ধর্ম প্রভৃতির অনুশীলন করে। কোথাও তারা উন্নততর কৃষি বিদ্যাশিক্ষা করে, কোথাও তারা জার্মান, ফরাসী, ইংরাজী প্রভৃতি ভাষা শিক্ষা করে। তবে সাধারণতঃ জাতীয় চরিত্র গঠন, তৎদেশীয় কৃষ্টির সংরক্ষণ এবং উন্নয়ন বয়স্ক শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য। এখানেও নিরক্ষরতা দূরীকরণ বয়স্ক শিক্ষার কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত নয়। আবার মার্কিন

যুক্তরাষ্ট্রে বয়স্ক শিক্ষার প্রধান কাজ হলো মার্কিন জীবনযাত্রা প্রণালীতে (American way of life) শিক্ষার্থীদের উদ্বুদ্ধ করা।

আমাদের দেশে বয়স্ক শিক্ষা আন্দোলন দীর্ঘ দিনের হলেও অগ্রগতি একটানা নয়। এ আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে। তখন বয়স্ক নরনারীদের লিখতে পড়তে শিখানই এর প্রধান কর্মসূচী বলে পরিগণিত হতো। বয়স্ক শিক্ষার কাজ শুরু হয়েছিল নৈশবিদ্যালয়ে। মহীশূর রাজ্যে স্যার বিশ্বেশ্বরায় বয়স্ক শিক্ষা প্রসারের জন্য গবেষণা কার্য শুরু করেছিলেন। কেবল ঐ রাজ্যেই নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য ছয় সাত হাজার নৈশ-বিদ্যালয় স্থাপন করা হলো। কিন্তু কিছুকাল পরে তিনি ঐ রাজ্য থেকে অন্যত্র চলে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে মহীশূরে বয়স্ক শিক্ষার অগ্রগতিও স্তিমিত হয়ে গেল।

উনিশ শ' সাতাশ সাল নাগাদ ভারতে বয়স্ক শিক্ষার আবার কিছুটা উন্নতি পরিলক্ষিত হল। তার মূলে ছিল রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধি এবং সমবায় আন্দোলনের কিছুটা অগ্রগতি। লোকের মনে এ সময়ে বয়স্ক শিক্ষার প্রতি আকর্ষণ বর্ধিত হল। আবার বছর-দুই পরে নানা কারণে বয়স্ক শিক্ষার অগ্রগতিতে ভাটা দেখা দিল।

প্রদেশগুলোতে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রথা প্রবর্তিত হওয়ার পরে বিভিন্ন প্রদেশে আবার বয়স্ক শিক্ষা প্রসারের জন্য নতুন করে চেষ্টা চলল। নৈশবিদ্যালয়, পাঠাগার প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান নতুন করে গড়ে উঠতে লাগল। বিহারে ডক্টর সৈয়দ মামুদ আর মাদ্রাজে রাজাগোপালাচারী এই আন্দোলনকে বেশী তেজী করে তুললেন। কিন্তু আবার বয়স্ক শিক্ষার অগ্রগতি মন্থর হলো দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে। মন্থরতা অব্যাহত থাকল যুদ্ধোত্তর কালেও, যখন দেশে দারুণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিল এবং তারপর যখন দেশ সাম্প্রদায়িক মনোমালিন্যে ক্ষত বিক্ষত হতে লাগল। কেবল দু' একটি রাজ্যে বয়স্ক শিক্ষার কাজ কোন ক্রমে চলছিল।

তারপর উনিশ শ' সাতচল্লিশে দেশে এল স্বাধীনতা। নানাদিক থেকে ভাবধারায় হতে লাগল পরিবর্তন। শিক্ষাও তা থেকে বাদ গেল না। নতুন গরজ মিটাবার জন্য নতুন ধরণের পরিকল্পনা রচিত হল। সকল বয়স্ক ভারতবাসীর মধ্যে সমানভাবে সাধারণ শিক্ষা-প্রসারের জন্য এবং তাদের নতুন গণতন্ত্রের আদর্শে নাগরিক করে গড়ে তুলবার জন্য নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হল। এবার এর নাম হল সামাজিক শিক্ষা। ভারতের নিরক্ষরতা দূরীকরণের যে কর্মসূচী এতদিন অনুসৃত হলো তাও সামাজিক শিক্ষার কর্মসূচীতে বিশিষ্ট স্থান পেল। নতুন যে সব কর্মসূচী এ ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত হল তাহলো স্বাস্থ্য বা শরীর ভাল রাখার উপায় সম্বন্ধে শিক্ষা দান, নাগরিকের দায়িত্ব পালন ও অধিকার ভোগের উপায় সম্বন্ধে শিক্ষা দান, আর্থিক অবস্থা উন্নয়নের উপায় নির্দেশ, ব্যক্তি এবং সমাজের গরজের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে অবসর বিনোদন এবং মনোরঞ্জনের ব্যবস্থার নির্দেশ।

নতুন যে ব্যবস্থা হলো তা নামান্তরে বয়স্ক শিক্ষা। নতুন পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে নতুন কর্মসূচী সংযোজন ছাড়া এতে আর বিশেষ তফাৎ কিছু নেই। তবুও প্রশ্ন উঠা অস্বাভাবিক নয়—এ দুটোর মধ্যে মূলগত কোন পার্থক্য আছে কিনা। বাস্তবিক পক্ষে কেবল নামে নয়, কার্যতঃ ও দুটোর মধ্যে সামান্য পার্থক্য রয়েছে। অবশ্য এ পার্থক্য তেমন লক্ষ্যণীয় নয়।

উদ্দেশ্যের দিক থেকে বিচার করলে দেখা যায় আদর্শ নাগরিক গড়ে তোলাই হচ্ছে সামাজিক শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। যে সকল কর্মসূচী সামাজিক শিক্ষা ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত হবে সেগুলো শিক্ষার্থীকে আদর্শ নাগরিক হবারই সুযোগ দিবে। অপর দেশের ভাষাশিক্ষা এর অন্তর্ভুক্ত না হলেও কোন ক্ষতি নেই। অপর পক্ষে বয়স্ক শিক্ষার উদ্দেশ্য হল শিক্ষায় বঞ্চিত বয়স্কদের শিক্ষার সুযোগ দান কিংবা অল্প শিক্ষিত বয়স্কদের অধিকতর শিক্ষার সুযোগ দান।

সামাজিক শিক্ষার সকল কর্মসূচীই এতে স্থান পেতে পারে। তাছাড়া বৃত্তি সম্বন্ধে শিক্ষা, কিংবা অপর দেশের ভাষা শিক্ষা কিংবা গার্হস্থ্য বিজ্ঞান শিক্ষা এতে সহজে স্থান পেতে পারে। বয়স্ক শিক্ষার শিক্ষণীয় বিষয় ব্যাপক। যদি সামাজিক শিক্ষা আদর্শ নাগরিক গড়ে তোলার উপর গুরুত্ব আরোপ করে, তবে বয়স্ক শিক্ষা গুরুত্ব আরোপ করবে অধিকতর শিক্ষার উপর।

কাদের জন্য এই শিক্ষা, ঠিক সে দিক থেকে বিচার করলে দেখা যায় সামাজিক শিক্ষা সকল বয়সের লোকেদের জন্য। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা এতে শিক্ষার্থী হতে পারে। ছোট শিশুরা এ শিক্ষা পায় আপন গৃহে। বালক বালিকা এ শিক্ষা পায় বিদ্যালয়ে। আর প্রাপ্তবয়স্ক এ শিক্ষা পায় সামাজিক শিক্ষা কেন্দ্রে। কিন্তু নাম থেকেই বুঝা যায় বয়স্ক শিক্ষা কেবল বয়স্কদের জন্য, অন্ততঃ শিশুদের জন্য নয়। এদিক থেকে দেখতে গেলে দেখা যায় বয়স্ক শিক্ষার ক্ষেত্র অপেক্ষা সামাজিক শিক্ষার ক্ষেত্র অধিকতর ব্যাপক।

যে তারতম্যের কথা বলা হল সে তারতম্য নিতান্ত সূক্ষ্ম এবং প্রায় অবহেলার যোগ্য। বাস্তবিক পক্ষে কোথাও একনামে কোথাও অপর নামে একই ধরণের শিক্ষাই দেওয়া হয়। বেশী সংখ্যক ক্ষেত্রেই এ ধরনের শিক্ষার নাম হয় বয়স্ক শিক্ষা। আমাদের দেশেও এর নাম বয়স্ক শিক্ষাই ছিল। নতুন নামকরণ অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে গুরুত্ব আরোপণের পরিবর্তনই সূচনা করল। তাতেই বয়স্ক শিক্ষা সামাজিক শিক্ষা নাম গ্রহণ করল। সামাজিক শিক্ষার মধ্যে বয়স্ক শিক্ষার কর্মসূচীও রয়েছে। কেবল দৃষ্টি ভঙ্গিটিকে একটু ঘুরিয়ে দেওয়া হলো।

যখন সামাজিক শিক্ষার কথা বলা হয় তখন সাধারণ ভাবে বয়স্কদের শিক্ষার কথাই মনে করা হয়।

(পাঁচ)

বয়স্ক শিক্ষায় মন, শরীর ও অভিজ্ঞতার প্রভাব (Psychology

আজকাল ভিন্ন ভিন্ন নামে হলেও সকল প্রগতিশীল রাষ্ট্রেই বয়স্ক শিক্ষার প্রচলন রয়েছে। একথা এখন সর্বত্রই স্বীকৃত হচ্ছে যে জীবনভর শিক্ষার সুযোগদান যত প্রসার লাভ করবে মানুষ ততই সুষ্ঠু থেকে সুষ্ঠুতর জীবন যাপনের পথে অগ্রসর হবে।

বয়স্কদের শিক্ষার ব্যবস্থা যাঁরা করেন বা যাঁরা তাদের শিক্ষা দান করেন, তাঁদের কয়েকটি কথা মনে রেখে কাজে অগ্রসর হতে হয়। তাঁদের মনে রাখতে হয় শিশুদের এবং বয়স্কদের মনের গঠন, শরীরের প্রয়োজন এবং অভিজ্ঞতার পরিধি পৃথক ধরনের। কাজেই শিশুদের শিক্ষার জন্য যে পদ্ধতি অবলম্বন করা যেতে পারে, বয়স্কদের শিক্ষার ক্ষেত্রে সে পদ্ধতি অনেক সময়ই সফল হয় না। এই দুই ক্ষেত্রে পৃথক পদ্ধতি অবলম্বন করতে হয়।

বয়স্কদের বুদ্ধি এবং বিচার শক্তি শিশুদের বুদ্ধি এবং বিচার শক্তি অপেক্ষা অধিকতর বিকশিত। কাজেই যে বিষয়টা বুদ্ধি-গ্রাহ্য বা বিচারসহ নয়, তা শিশুর নিকট গ্রহণযোগ্য হতে পারে, কিন্তু তা বয়স্কদের নিকট সহজে গ্রহণযোগ্য নয়। বয়স্কদের কাছে বুদ্ধি-গ্রাহ্য বস্তুই পরিবেশন করতে হয়। আর তা পরিবেশনে যুক্তির সাহায্য নিতে হয়। শিক্ষককে মনে রাখতে হয় প্রতি পদে তাকে 'কেন' 'কি করে হল' প্রভৃতি প্রশ্নের জবাব দিতে হবে। সঠিকভাবে যুক্তি সহকারে পরিবেশন করলে বয়স্কদের পক্ষে তা কেবল গ্রহণ করা নয়, ধরে রাখাও সহজ হয়।

মানুষের বয়স যত বাড়তে থাকে স্মৃতি শক্তি তত না কমলেও তার রূপ বদলাতে থাকে। শিশুদের শাব্দ স্মৃতিশক্তি (verbal memory) বেশ প্রবল। অর্থপূর্ণ হোক আর নিরর্থক হোক, শব্দ

বা অক্ষর শিশু সহজে মনে রাখতে পারে। বর্ণমালা বা ছড়াগুলো তাই শিশুরা সহজে মনে রাখে। বয়স্কদের শব্দ স্মৃতি শক্তি কমে যায়। ফলে নিরর্থক বর্ণমালা বা ছড়া আয়ত্ত করা বা মনে রাখা তাদের পক্ষে সহজ নয়। কিন্তু বুদ্ধি বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বয়স্কদের ভাবগত স্মৃতিশক্তি (idea memory) বেড়ে যায়। ফলে তারা একটা অর্থপূর্ণ কথা বা ভাব সহজে আয়ত্ত করতে পারে এবং মনে রাখতে পারে। বয়স্ক শিক্ষার শিক্ষকদের তাই অর্থপূর্ণ বিষয়ই শিক্ষার্থীদের নিকট পরিবেশন করতে হয়। বর্ণমালা শিখাতে গেলেও তাদের মনে রাখতে হয়, অ, আ, ক, খ গুলো পৃথক ভাবে অর্থবিহীন। এগুলো একের পর এক করে মনে রাখা তাদের পক্ষে কঠিন। অথচ অর্থপূর্ণ শব্দ বা বাক্যের সাহায্যে এগুলো আয়ত্ত করা বা মনে রাখা তাদের পক্ষে কঠিন নয়। বয়স্ক ব্যক্তি সুসংবদ্ধ কাহিনী বিচ্ছিন্ন নিরর্থক ঘটনা অপেক্ষা অধিকতর সহজে গ্রহণ করে এবং ধরে রাখতে পারে।

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মনে 'অহং' ভাব জাগতে থাকে। তখন তার আত্মসম্মান জ্ঞান স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হতে থাকে। শিশুর মনে এ ভাবটা নেই, থাকলেও তা প্রবল নয়। ফলে তিরস্কার বা প্রহার শিশুর কাছে তেমন একটা মনে করার মত কিছু নয়। পক্ষান্তরে শিক্ষার ক্ষেত্রে বয়স্কদের বেলা প্রহারের ত কোন প্রশ্নই উঠে না। তিরস্কারও হানিকর। তাতে বয়স্ক সহজেই মনে করে অপর দশজনের কাছে তার সম্মানের লাঘব ঘটে। কাজেই বয়স্ক শিক্ষার শিক্ষককে মনে রাখতে হয়, যেন তার কোন কথায় বা আচরণে বয়স্ক শিক্ষার্থীর আত্মসম্মান বোধে আঘাত না লাগে। বরং তার মধ্যে আত্মসম্মান বোধটা বাড়িয়ে দেওয়াই বাঞ্ছনীয় হবে। শিক্ষক এক শিক্ষার্থীকে অপর শিক্ষার্থী অপেক্ষা এমন কি শিক্ষক অপেক্ষা হীন মনে করলে শিক্ষার্থীর মনে আঘাত লাগবে। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে বিশিষ্ট এক বা একাধিক গুণ আছে। শিক্ষক যদি সম্ভ্রম

সহকারে সেগুণের উল্লেখ করে, তবে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর আত্মসম্মান বোধ তৃপ্ত হয়। তৃপ্তির পরিবেশে শিক্ষার কাজ সহজে অগ্রসর হয়।

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মনে নিজস্ব রুচিও গড়ে উঠে। শিশুর রুচি শিক্ষক নিজে গড়ে তুলতে পারে। কিন্তু বয়স্ক ব্যক্তির রুচির পুষ্টি সাধন করা চলে কিংবা তার আংশিক পরিবর্তন সাধন করা চলে, গঠন করা কঠিন হয়। বয়স্ক শিক্ষার শিক্ষককে যথাসম্ভব শিক্ষার্থীর রুচির কথা মনে রেখে কাজে অগ্রসর হতে হয়। যদি কোন রুচির পরিবর্তন প্রয়োজন মনে হয় তবে সে পরিবর্তনের কাজেও সর্তকতা সহকারে অগ্রসর হতে হয়।

যে সকল শিক্ষার্থীর জন্য বয়স্ক শিক্ষার ব্যবস্থা, তাদের মনের অর্থচিন্তা বা অন্ন চিন্তা অপর সকল চিন্তাকে প্রায় আচ্ছন্ন করে রাখে। ফলে যে কাজের বা যে শিক্ষার সঙ্গে অর্থোপার্জনের মোটেই যোগ নেই, সে কাজ বা সে শিক্ষা তাদের মনকে সহজে আকৃষ্ট করতে পারে না। সে জন্যই বয়স্ক শিক্ষার ব্যবস্থায় অর্থকরী শিক্ষার কিছুটা স্থান দিতে হয়। কৃষ্টিমূলক শিক্ষা মানুষের মনকে উদার করে, সুন্দর করে সন্দেহ নেই। কিন্তু অর্থকরী শিক্ষা মানুষের ব্যবহারিক জীবনকে অর্থপূর্ণ করে।

শিশুর মনে নিজস্ব কোন দৃষ্টিভঙ্গি বা জীবনাদর্শের বালাই নেই বললেও চলে। কিন্তু বয়স্ক ব্যক্তির একটা নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি থাকা খুবই স্বাভাবিক। সে দৃষ্টিভঙ্গি যদি সঙ্গত না হয় তবে তা ধীরে ধীরে বদলানো চলে। মুহূর্তে তার পরিবর্তন সম্ভব নয়। শিশুর নিজস্ব কোন দৃষ্টিভঙ্গি নেই বলে সহজে শিক্ষক নিজের অভিমত তার উপর চাপিয়ে দিতে পারে। কিন্তু বয়স্ক ব্যক্তির নিজস্ব মতামত থাকার ফলে তাকে কোন মত গ্রহণ করাতে বেশ কিছুটা যুক্তি তর্কের অবতারণা করতে হয়। এ সব ক্ষেত্রে শিক্ষা পদ্ধতিতে আলোচনার একটা বিশিষ্ট স্থান নির্দেশ করতে হয়।

বয়স্ক ব্যক্তির মনের উপর কর্মের সাফল্য বা অসাফল্যের প্রভাব

খুব বেশী। সাফল্যে আনন্দ এবং অসাফল্যে নৈরাশ্য শিশুর মনেও জাগে। কিন্তু তার প্রভাবটা স্থায়ী হয় না। বয়স্ক ব্যক্তির মনে সাফল্য-অসাফল্যের যে প্রভাব তা দীর্ঘস্থায়ী হয়। সাফল্যে উৎফুল্ল হয়ে কাজে অধিকতর উৎসাহী হওয়া এবং অসাফল্যে হতাশ হয়ে কাজে অধিকতর নিরুৎসাহ হওয়া বয়স্ক ব্যক্তির স্বভাব। কাজেই যাদের উপর এদের শিক্ষার ভার থাকবে তাদের এমন সব উপায় অবলম্বন করতে হবে যার ফলে সহজে অসাফল্য দেখা দিবে না। শিক্ষার উপায় উদ্ভাবন এবং অবলম্বনে সব সময় একথা মনে রাখতে হবে।

বয়স্ক ব্যক্তির নিকট কোন একটি বিষয়ের প্রয়োজনাতিরিক্ত বর্ণনা বা আলোচনা সহজেই বিরক্তিকর বলে মনে হয়। শিশুর কাছে এধরণের আলোচনা বা বর্ণনা তেমন বিরক্তিকর মনে হয় না। কাজেই শিশুশিক্ষায় পুনরুক্তি বা বিষদ বর্ণনা আপত্তিজনক নয়। কিন্তু বয়স্কদের ক্ষেত্রে এগুলো যথাসম্ভব বর্জনীয়। বিষয় পরিবেশনে সব সময় সরসতার দিকে লক্ষ্য রাখতে হয়। তা ছাড়া কিছু সময়ের ব্যবধানে আনন্দানুষ্ঠানের ব্যবস্থাও রাখতে হয়।

বয়স্ক ব্যক্তির এবং শিশুর শারীরিক গঠনের পার্থক্য শিক্ষা ব্যবস্থার উপর কিছুটা প্রভাব বিস্তার করে। শিশু অল্প পরিশ্রমেই ক্লান্ত হয় আবার সামান্য বিশ্রামেই তার অঙ্গের ক্লান্তি দূর হয়। বয়স্কদের ক্লান্তি আসে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে, আবার এই ক্লান্তি দূর করতে বিশ্রামেরও প্রয়োজন হয় একটু বেশী। বয়স্ক ব্যক্তিরা, বিশেষ করে যারা সামাজিক শিক্ষার জন্য মিলিত হয় তারা সারাদিন পরিশ্রমের পর হয়ত সন্ধ্যায় বা রাত্রে আবার দৈহিক পরিশ্রম এমনকি মানসিক পরিশ্রম করতে আগ্রহশীল হয় না। শ্রমক্লান্ত দেহকে বিশ্রামের মধ্য দিয়ে সতেজ করে নেওয়া তাদের দরকার। তাই তাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় দৈহিক পরিশ্রমকে এড়িয়ে চলতে হবে, আনন্দ বিধানের উপায় খুঁজতে হবে।

দৈহিক শিক্ষা সকল শিক্ষার অঙ্গ। শিশুর দেহে যে নমনীয়তা থাকে বয়স্ক ব্যক্তির দেহের বিভিন্ন অংশে সে নমনীয়তা থাকে না। ফলে দেহ চর্চার দ্বারা শিশুর দেহের প্রত্যঙ্গ বা মাংসপেশীর পুষ্টি সাধন হয়। কিন্তু বয়স্ক ব্যক্তির দেহ চর্চার দ্বারা শরীরের পুষ্টিবিধান করার সম্ভাবনা কম। তাই শারীর শিক্ষার ক্ষেত্রে বয়স্কদের পক্ষে নিয়ম নির্দেশ এবং অভ্যাস গঠনই যথেষ্ট, যদিও শিশুর ক্ষেত্রে তার সঙ্গে চর্চাও জুড়ে দিতে হয়। অবশ্য আনন্দানুষ্ঠানের জন্য মাঝে মাঝে খেলাধূলার ব্যবস্থাও করতে হয়।

বয়স্কদের অভিজ্ঞতার পরিধি শিশুদের অভিজ্ঞতার পরিধি অপেক্ষা বৃহত্তর। তারা দেখেছে, শুনেছে, উপলব্ধি করছে অনেক। শিশুদের তেমন দেখা শুনার বা উপলব্ধি করার সুযোগ হতে পারে না। একটা নতুন বিষয় শিখাতে হলে বিষয়টাকে পুরাতন অভিজ্ঞতার সঙ্গে যদি মিলিয়ে দিতে পারা যায়, তা শিক্ষার্থীর কাছে সহজগ্রাহ্য হয় এবং তা শিক্ষার্থী সহজে মনেও রাখতে পারে। যে ব্যক্তি উনিশ শ' বিয়াল্লিশের দুর্ভিক্ষের লীলা নিজে প্রত্যক্ষ করেছে, তার কাছে ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের ছবি ফুটিয়ে তোলা তেমন কিছু কঠিন কাজ নয়। অথচ যে তা প্রত্যক্ষ করেনি, সে শিশুর পক্ষে ছিয়াত্তরের মন্বন্তর আয়ত্ত করা দুরূহ কাজ। বয়স্কদের শিক্ষার ক্ষেত্রে এটা একটা অনুকূল অবস্থা। শিক্ষকদের শিক্ষাদান কালে একথাটা মনে রাখতে হয় এবং নতুন কিছু শিক্ষার সময় যথাসম্ভব পূর্বের অভিজ্ঞতার সঙ্গে তাকে মিলিয়ে দিতে হয়।

যাদের অভিজ্ঞতার পরিধি বিস্তৃত তারা সব কিছুই অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে গ্রহণ বা বর্জন করতে চায়। নিছক কল্পনা প্রসূত কোন জিনিষ, যার সঙ্গে পূর্বের অভিজ্ঞতার কোন মিল নেই বরং প্রত্যক্ষ বিরোধ রয়েছে, তেমন জিনিষ বয়স্কদের কাছে পরিবেশন করে লাভ নেই। কারণ তারা তা গ্রহণ করতে চাইবে না। কাজেই বয়স্ক শিক্ষার শিক্ষকের পক্ষে সমীচীন হবে কেবল তাদের কাছে

সে বস্তু পরিবেশন করা, বাস্তবে যার অস্তিত্ব রয়েছে, যাকে তারা তাদের পূর্বাভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে পারে।

এপ্রসঙ্গে শিশু এবং বয়স্ক ব্যক্তির মনে পরিবেশের প্রভাবের কথা উল্লেখযোগ্য। একথা অনস্বীকার্য যে শিক্ষার ক্ষেত্রে কি শিশু কি বয়স্ক সকলের পক্ষেই মনোরম আনন্দময় পরিবেশের প্রয়োজন। এব্যাপারেও বয়সের দরুণ একটু তারতম্য ঘটে। শিশু শিক্ষার ক্ষেত্রে শ্রেণীকক্ষে একটু গোলমাল বা হৈ-চৈ খুব একটা বেশী অসুবিধার স্থষ্টি করে না। এক কক্ষে উচ্চৈঃস্বরে নামতা পড়া হচ্ছে আর পরবর্তী কক্ষে ছেলেরা একমনে আঁক কষছে, এ দৃশ্য পল্লী-বিদ্যালয়ে নিতান্ত বিরল নয়। বয়স্কদের বেলা কিন্তু এটা ঠিক হবে না। সারাদিন পরিশ্রম করে এসে স্বভাবতই তারা একটু শান্তিপূর্ণ পরিবেশ কামনা করে। সারাদিনের পরিশ্রমের ফলে যে দৈহিক ক্লান্তি তাদের অবসন্ন করে, তা অপনোদনের জন্য বয়স্কদের শ্রেণীকক্ষে আলোবাতাসের ব্যবস্থা থাকা চাই।

বয়স্ক শিক্ষার পক্ষে কাজেই আমরা দেখতে পাই কাজে অগ্রসর হবার সময় শিশুর এবং বয়স্কের মনের ও শরীরের গঠন, অভিজ্ঞতার পরিধি প্রভৃতির কথা সব সময়েই মনে রাখতে হয়।

(ছয়)

কেন নিরক্ষরতা দূরীকরণ

পূর্ণাঙ্গ সামাজিক শিক্ষা বা বয়স্ক শিক্ষার নানা উপায়ের মধ্যে নিরক্ষরতা দূরীকরণ অন্যতম। একজন নিরক্ষর বয়স্ককে লিখতে পড়তে শিখিয়ে দিতে পারলে, তার পর সামান্য একটু নির্দেশ বা পরামর্শ দিলেই সে আপন চেষ্টায় তার সমাজ জীবনের জ্ঞাতব্য বিষয় বই পড়ে জেনে নিতে পারে। জ্ঞাতব্য বিষয় এত বেশী যে দেখিয়ে শুনিয়ে সব কিছু শিখান প্রায় অসম্ভব। অথচ লেখাপড়া শিখিয়ে দিলে জ্ঞাতব্য বিষয়ের পরিধি লোকের জ্ঞানার্জনের পথের বড় অন্তরায় হতে পারে না।

শিক্ষায় অনগ্রসর দেশগুলোতে নিরক্ষরতা দূরীকরণের আরও অনেক প্রয়োজন রয়েছে। বয়স্ক শিক্ষা সংক্রান্ত কুরিয়ার "Courior" নামক বিখ্যাত পত্রিকায় উনিশ শ' আটান্ন সালের মার্চ সংখ্যায় বিশ্ব জাতিসঙ্ঘ শিক্ষা-বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থার নিম্নলিখিত মন্তব্য উল্লেখযোগ্য।

"নিরক্ষরতা যে পুষ্টিহীনতা, মহামারী, দারিদ্র, ব্যর্থশ্রমতা এবং নৈতিক অবনতির সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে চলে তার যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে। অবশ্য তার অর্থ এই নয় যে, নিরক্ষরতাই এগুলোর কারণ বা লোকেরা কেবল লিখতে পড়তে শিখলেই কোন দেশ থেকে এগুলো দূরীভূত হবে। কিন্তু এখন আর একথা স্বীকার না করে উপায় নেই যে অনুন্নত অঞ্চলগুলোর সামাজিক ও অর্থ নৈতিক উন্নতি নির্ভর করছে আধুনিক উৎপাদন এবং বণ্টন পদ্ধতি এবং সমাজকল্যাণ বিধি আয়ত্তীকরণের উপর। এই আয়ত্তীকরণ নির্ভর করছে শিক্ষার উপর, আর সেই শিক্ষার মূলেই হল লিখতে পড়তে শিখা।"

এই সংস্থা পরিসংখ্যান সংগ্রহ করে নানাধরণের পরীক্ষা নিরীক্ষার

সাহায্যে উপরের এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে। এ সিদ্ধান্ত অবিসংবাদী বলেই আমরা গ্রহণ করতে পারি।

আজকাল সকল উন্নত দেশই গণতন্ত্রশাসিত। সকল নাগরিকের বুদ্ধিদীপ্ত অবদানের উপর নির্ভর করে গণতন্ত্রের সাফল্য। নাগরিকরা রাষ্ট্রকে মূল্যবান কিছু দিতে পারে কেবল তখন, যখন তারা লেখাপড়ার মাধ্যমে সব কিছু জানতে পারে, বুঝতে পারে। বোম্বাই রাজ্যের শিক্ষাধিকর্তা একবার একটি রিপোর্টে মন্তব্য করেছিলেন, "শিক্ষিত নির্বাচকমণ্ডলীই হল গণতন্ত্রের অপরিহার্য উপাদান। সাধারণ লোকেরা হল দেশের মেরুদণ্ড। শাসন পরিচালনে তাদের হাত থাকবেই। রাজনৈতিক ব্যাপারগুলোতে সফল হস্তক্ষেপের জন্য সাক্ষরতার প্রয়োজন অনস্বীকার্য।" শাসনকার্য পরিচালনার জন্য যে জ্ঞান এবং নিপুণতার প্রয়োজন তা অধ্যয়ন এবং অনুশীলন-লভ্য। দীর্ঘকালপূর্বে লেনিন বলেছিলেন, "নিরক্ষর লোক রাজনীতির বাইরে, তাকে আগে অক্ষরজ্ঞান দান করতে হবে।"

আমাদের দেশে যে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তন করার চেষ্টা হচ্ছে তার জন্য প্রকৃত ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে হলে আগে বয়স্কদের নিরক্ষরতা দূর করতে হবে। ভারতের কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা সংস্থা কর্তৃক নিযুক্ত বয়স্ক শিক্ষা কমিটির মন্তব্য এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। সে কমিটি বলেছিল, "নিরক্ষর মাতাপিতা নিজ সন্তানের বা অপরের সাক্ষরতার মূল্য বুঝে না। এ ধরণের বহু পিতামাতার অস্তিত্ব বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের পথে একটা মস্তবড় অন্তরায়।" এ উক্তির উপর কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা সংস্থা যে মন্তব্য করেছে তাও প্রণিধানযোগ্য। এই সংস্থা বলেছে, "এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই যে সাক্ষর পিতামাতা প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রগতি ত্বরান্বিত এবং ফলপ্রসূ করে। তবে পিতামাতাকে সার্থকভাবে পুরোপুরি এ ভূমিকা গ্রহণ করতে হলে কেবল তাদের মধ্যে অক্ষরজ্ঞান হলেই চলবেনা। তাদের জন্য অধিকতর এবং অবিরাম শিক্ষার ব্যবস্থাও করতে হবে, যার ফলে

তারা শিক্ষার অর্থ এবং মূল্য সম্যক উপলব্ধি করতে পারবে।" একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে লেখাপড়া জানা পিতামাতা সন্তানের শিক্ষার ব্যাপারে আগ্রহশীল হয়। এটাও লক্ষ্য করার বিষয় যে শিক্ষাধীন শিশুরা বিদ্যালয়ের পরিবেশে অল্প সময় কাটিয়ে অবশিষ্ট সময় যদি নিরক্ষর পিতামাতার পরিবেশে কাটায়, তাহলে তারা শিক্ষার পথে সহজে অগ্রসর হতে পারে না। তাই কেবল প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্র প্রস্তুতি করণে নয়, প্রসার সাধনেও বয়স্কদের মধ্যে নিরক্ষরতা দূরীকরণ প্রয়োজনীয়।

কারখানা বা কৃষিক্ষেত্রের শ্রমিকদের সাধারণতঃ শিক্ষার প্রয়োজন নেই বলে মনে করা হয়। কিন্তু সর্বক্ষেত্রেই দেখা গেছে যে একজন নিরক্ষর শ্রমিক অপেক্ষা একজন অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন শ্রমিক অধিকতর কুশলী হয়। অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তির উৎপাদন উন্নতধরণের এবং তার পরিমাণও বেশী হয়। বহু শিল্প প্রতিষ্ঠান যে শ্রমিকদের শিক্ষার ব্যবস্থা করে, তার অন্যতম কারণ হলো, তারা জানে যে একজন লেখাপড়া জানা শ্রমিকের কাছ থেকে তারা উন্নতধরণের এবং অধিক পরিমাণের কাজ পায়।

জগতের এক প্রান্তের সঙ্গে অপর প্রান্তের যোগাযোগ এবং এক প্রান্তের উপর অপর প্রান্তের নির্ভরশীলতা এত বৃদ্ধি পেয়েছে যে মনে হয় যেন পৃথিবীটা ঠাস-বোনা হয়ে ছোট হয়ে এসেছে। এই ঠাস-বোনা গোটা পৃথিবীর এক প্রান্তের ঘটনাবর্ত অপর প্রান্তের উপর সর্বদা প্রভাব বিস্তার করছে। কোন না কোন প্রান্তের অবস্থার পরিবর্তন এক সময় হয়েই থাকে। এই পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে পরিচিত হতে পারলে, এর কথা চিন্তা করতে পারলে, মানুষ নিজের কার্যকলাপ দ্বারা নিজের এবং দেশের উপকার সাধন করতে পারে। সাধারণ চীনবাসীরা আজ যদি চীনকর্তৃক অযথা ভারত আক্রমণের ফলে যুক্তরাষ্ট্রে কি প্রতিক্রিয়া হয়েছে তা জানতে পেরে চীন সরকারকে সংযত করতে পারে তাতে বিশ্বের কল্যাণ হবে। ভারতের এবং

চীনের কল্যাণ হবে। সাধারণ চীনবাসীরও কল্যাণ হবে। নিত্য নিয়ত পরিবর্তনশীল জগতের খবর রাখতে হলে মানুষকে সংবাদপত্র বা সদ্যপ্রকাশিত গ্রন্থাদি পাঠ করতে হয়। শুধু লোকের কাছে শুনে তা আয়ত্ত করা বা তার সম্বন্ধে মতামত গঠন করা সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। অক্ষরজ্ঞান অর্জন করে লিখতে পড়তে শিখলে মানুষ অধ্যয়নের সাহায্যে সহজে তা করতে পারে। নিরক্ষর ব্যক্তিকে সাধারণ কথায় অন্ধের সঙ্গে তুলনা করা হয়। অন্ধ কিছুই দেখতে পায় না। নিরক্ষর ব্যক্তি তার চোখের সাহায্যে সামান্য কিছু দেখতে পায়। তার বাইরে যা আছে, লেখাপড়া জানা লোক যা পড়ে মানস-নেত্রে দেখতে পায়, নিরক্ষর ব্যক্তি তা দেখতে পায় না।

মানুষ যদি অক্ষর-জ্ঞান-সম্পন্ন হয়ে পড়তে শিখে তাহলে তার মনের উদারতা বেড়ে যায়। নতুন নতুন তথ্য জেনে সে নিজের মনের ক্ষুদ্র কোণ থেকে অজ্ঞাতেই বেরিয়ে আসে। বিশাল বিশ্ব এসে তার কাছে ধরা দিতে চায়। বিভিন্ন জ্ঞানীগুণীর মতামতের সঙ্গে সম্যক পরিচিত হয়ে মানুষ অধিকতর আত্মপ্রত্যয়ের অধিকারী হয়। নিজের ছোটখাট সমস্যাগুলির সমাধান সে অতি সহজে খুঁজে পায়। অধ্যয়নের সাহায্যে অধিকতর অভিজ্ঞতা লাভ করে কর্মক্ষেত্রে সে ব্যক্তি অধিকতর বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেয়। উন্নততর প্রকাশভঙ্গির সঙ্গে অধ্যয়নের মাধ্যমে পরিচিত হয়ে মানুষ নিজের বক্তব্য সুষ্ঠুতরভাবে প্রকাশ করতে পারে। ফলে সহজে সে অপরকে নিজ মতে আস্থাশীল করে তুলতে পারে। সুষ্ঠু ভাষণের গুণে অপরের কাছে সহজে নিজেকে প্রিয় করে তুলতে পারে। সমাজে প্রতিষ্ঠালাভের পথ তার কাছে সুগম হয়।

বিজ্ঞানের দ্রুত উন্নতির যুগে নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার উৎপাদনের নানা সহজ পন্থা নির্দেশ করছে। ফলে মানুষের শ্রমের লাঘব হচ্ছে, উৎপাদনব্যয়ও কমে যাচ্ছে। এই সকল আবিষ্কারের

নির্ভুল তথ্যাদি আজকাল সাময়িক পত্রিকায় কিংবা নানা গ্রন্থে সন্নিবেশিত হচ্ছে। লিখতে পড়তে শিখলে মানুষ মুদ্রিত তথ্যাদি সহজে সংগ্রহ করতে পারে এবং আবিষ্কারের সুফল সহজে ভোগ করতে পারে। তারা নিজেদের এবং দেশের অধিকতর সুখসুবিধা বিধান করতে পারে।

কল্যাণকামী রাষ্ট্রের সরকার নাগরিকদের অবগতির জন্য নানা সময়ে নানা বিজ্ঞপ্তি, ঘোষণা এবং নির্দেশ মুদ্রিত আকারে পরিবেশন করে থাকে। এ সকল বিজ্ঞপ্তি, ঘোষণা বা নির্দেশপত্রের সাহায্যে প্রচারিত তথ্যাদি সকল নাগরিকেরই নিজের এবং রাষ্ট্রের কল্যাণে জানা প্রয়োজন। পড়তে জানা নাগরিকরা সহজে এগুলো থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করতে পারে এবং সে অনুসারে কাজ করে সুখসুবিধা বিধান করতে পারে।

নিরক্ষর লোকেদের অপরের দ্বারা প্রতারিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে বেশী। ভারতের মত দেশে দুর্নীতিপরায়ণ মহাজনদের হাতে নিরক্ষর ঋণগ্রহণকারীদের নিগ্রহের কাহিনী, অসাধু দোকানদারদের হাতে নিরক্ষর খদ্দেরদের প্রতারণার কথা, এমন কি নীতিজ্ঞানহীন সরকারী কর্মচারীর হাতে নিরক্ষর নাগরিকের লাঞ্ছনার কথা অনেক শুনতে পাওয়া যায়। নিরক্ষর বয়স্করা অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন হয়ে উঠতে পারলে তারা এ ধরণের লাঞ্ছনার হাত থেকে রেহাই পায়। কেবল তাই নয়, একখানা চিঠি লেখা বা পড়ার মত সাধারণ কাজে তাদের যে বিড়ম্বনা, তার হাত থেকেও তারা মুক্তি পায়।

শিক্ষায় অনগ্রসর দেশগুলো হতে নিরক্ষরতা দূরীকরণের প্রয়াসের পশ্চাতে যে সকল কারণ রয়েছে তার অনেকগুলোই উল্লেখ করা হল! সকল ক্ষেত্রেই অবশ্য একথা অনস্বীকার্য যে নিরক্ষরতা দূরীকরণ মহত্তর উদ্দেশ্য সাধনের অন্যতম উপায়। একজন নিরক্ষর ব্যক্তিকে অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন করে দিলে জ্ঞানের আনন্দমেলার দরজাটি তার কাছে উন্মুক্ত করে দেওয়া হল। তার পর সে তার সামর্থ্য এবং রুচি

অনুযায়ী ঐ মেলায় প্রবেশ করে সেখানকার ভোগ্য বা উপভোগ্য বস্তু নিচয়ের আস্বাদ গ্রহণ করতে পারবে। উনিশ শ' চুয়াল্লিশ সালে একটি নিরক্ষরতা দূরীকরণ অভিযানের উদ্বোধন প্রসঙ্গে মেক্সিকোর তদানীন্তন প্রেসিডেন্ট বলেছিলেন, "আমি একথা সম্যকরূপে অবগত আছি যে নিরক্ষরতা দূরীকরণই শিক্ষাদান নয়, কিন্তু একথাও আমি জানি যে শিক্ষার পথে অগ্রসরণের প্রাথমিক এবং অপরিহার্য পদক্ষেপই হলো লিখতে পড়তে শিখা।"

(সাত)

বয়স্কদের নিরক্ষরতা দূরীকরণের পথে অন্তরায় কোথায়

বিশ্বের সকল জাতিই আপন আপন দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূরীকরণে বদ্ধপরিকর হয়েছে। না হয়ে উপায় নেই। নিরক্ষরতার গুরুভার স্কন্ধে বহন করে জ্ঞান, বিজ্ঞান, শিল্প, কলা, কৃষ্টির পথে অপরের সঙ্গে তাল রেখে এগিয়ে যাওয়া তুরূহ কাজ। আমাদের দেশের তিন চতুর্থাংশ লোকই নিরক্ষর। সে কারণেই বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমাদের অগ্রগমন হচ্ছে কূর্মগতিতে। এ গতি ত্বরান্বিত করতে হলে নিরক্ষরতা দূরীকরণের কাজও ত্বরান্বিত করতে হবে।

শিক্ষার তুই পৃথক শাখা থেকে যুগপৎ চেষ্টা করলেই নিরক্ষরতা দূরীকরণের কাজ ত্বরান্বিত হবে, ফল স্থায়ী হবে। একদিকে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে, অপর দিকে করতে হবে বয়স্ক শিক্ষার ব্যাপক ব্যবস্থা। আজকের শিশুদের শিক্ষা যদি বাধ্যতামূলক হয়, তবে দশ কি পনেরো বছর পরে এরা যখন বয়স্কের পর্যায়ে এসে যাবে তখন এদের জন্য নিরক্ষরতা দূরীকরণ ব্যবস্থার প্রয়োজন হবে না। সঙ্গে সঙ্গে এখন যারা নিরক্ষর বয়স্ক রয়েছে তাদের নিরক্ষরতা দূরীকরণ হলে, ক'বছর পরে আর লোকদের মধ্যে নিরক্ষরতা থাকবে না। আমাদের দেশের বয়স্কদের শিক্ষা দিতে পারলে, লেখাপড়া শেখা অভিভাবকরা শিশুদের শিক্ষায় আগ্রহশীল হবে। ফলে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার কাজও সহজ হবে।

বয়স্কদের নিরক্ষরতা দূরীকরণের কাজ বড় কঠিন। এর পথে অন্তরায় অনেক। নিরক্ষরদের আগ্রহের অভাবই হল বড় অন্তরায়। শৈশবে শিক্ষার প্রতি বিরূপভাব অথবা সুযোগের অভাবই ছিল অনেকের ক্ষেত্রে নিরক্ষরতার কারণ। পরিণত বয়সে তাদের ক্ষেত্রে সে কারণ অব্যাহতই থেকে গেছে। বরং কোন কোন ক্ষেত্রে অধিকতর দানা

বেঁধে উঠেছে। শৈশবে লেখা পড়া যাদের মন আকৃষ্ট করেনি, পরিণত বয়সে তাদের মন সেদিকে সহজে আকৃষ্ট হবে এমন আশা করা দুরূহ। যারা সময় বা অর্থের অভাবে লেখা পড়ার দিকে যেতে পারেনি, পরিণত বয়সে তাদের সময় বা অর্থের অভাব ঘুচে গেছে তেমন মনে করাও সঙ্গত হবে না। কাজেই শৈশবের আগ্রহের অভাব পরিণত বয়সে অব্যাহতই থেকে যায়। আগ্রহের অভাবে এদের শিক্ষাদান প্রচেষ্টা বাধাপ্রাপ্ত হয়।

সময়ের অভাব বয়স্কদের শিক্ষার পথে আর একটি অন্তরায়। নিরক্ষর বয়স্কদের সাধারণত সারা দিন কঠোর পরিশ্রম করে জীবিকা অর্জন করতে হয়। পরিশ্রমের পর যদি বা সামান্য অবসর তারা পায়, সে সময়টা বিশ্রাম করে কাটাতে চাওয়াটা তাদের পক্ষে অস্বাভাবিক নয়। বিশ্রাম করেই তারা পরবর্তী পর্যায়ের পরিশ্রমের জন্য প্রস্তুত হয়। এ অবস্থায় আবার শ্রম বা ক্লেশ স্বীকার করে লেখাপড়া শেখা তাদের পক্ষে কঠিন। সময়ের অভাবও এদের কাছে বড় একটা অন্তরায়।

জীবিকা অর্জনের চিন্তাই যাদের সব চাইতে বেশী তারা যেকাজে সরাসরি অর্থাগম হয় না সে কাজে সহজে আকৃষ্ট হয় না। তারা ভাবে নিরক্ষরতা দূরীকরণ কেন্দ্রে গিয়ে দুটো কথা বানান করতে বা দুটো শব্দ লিখতে না শিখে বরং নিজ গৃহে বসে বাঁশের ঝুড়ি বুনলে বা পাটের দড়ি তৈরি করলে তাদের জীবিকার উপায় হবে। কাজেই লেখাপড়া শেখার কাজে তাদের কোন তাগিদ থাকে না।

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের সাধারণ স্মৃতি শক্তি কমে যায়। শিক্ষার কাজে স্মৃতি শক্তির সাহায্য অপরিহার্য। শিক্ষার প্রথম চেষ্টাতে নিরক্ষর বয়স্ক যদি বুঝতে পারে যে তার স্মৃতি শক্তির আংশিক অভাব তার কাজে বাধা দিচ্ছে, তবে সহজেই সে নিরুৎসাহ হবে। আর শিক্ষার কাজে অগ্রসর হবে না। স্মৃতি শক্তির অভাব এমনি করে এদের শিক্ষার কাজে কিছুটা নিরুৎসাহ সৃষ্টি করে।

যে অন্তরায়ের কথা উল্লেখ করা হল, তা মোটামুটি বয়স্ক শিক্ষার্থীর দিক থেকে। শিক্ষাদানের দিক থেকেও কতগুলো অন্তরায় রয়েছে। এ ধরণের প্রধান অন্তরায় হল যোগ্য শিক্ষকের অভাব। পৃথকভাবে অতিরিক্ত অর্থবরাদ্দ করা সম্ভব নয় বলে সাধারণত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বয়স্কদের অক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন করার কাজে নিযুক্ত করা হয়। প্রকৃত পক্ষে শিশু শিক্ষার কাজে যে পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়, বয়স্ক শিক্ষার কাজে সে পদ্ধতি প্রায় অচল। কাজেই শিশুদের যোগ্য শিক্ষক বয়স্কদের যোগ্য শিক্ষক হবে তেমন আশা করা অনেক ক্ষেত্রেই ঠিক নয়। শিশু এবং বয়স্কের মধ্যে শরীর, মন, রুচি প্রভৃতির পার্থক্য খুব স্পষ্ট। শিক্ষার পদ্ধতিও কাজেই পৃথক হতে বাধ্য। সারাদিন শিশুদের শিক্ষা দিয়ে ক্লান্ত হয়ে সন্ধ্যায় বয়স্কদের শিক্ষা দিতে পৃথক পদ্ধতি সফলভাবে অবলম্বন করতে পারবে এমন শিক্ষক অনেক বেশী থাকতে পারে না। বিশ্ব শিক্ষা-বিজ্ঞান-কৃষ্টি সংস্থার উনিশ শ' বাষট্টি সালের নবেম্বর-ডিসেম্বরের এক বিবরণীতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বয়স্ক শিক্ষার কাজে নিযুক্ত করার প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, "প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষককে বয়স্ক শিক্ষার কাজে নিযুক্ত করলে কটা অসুবিধা দেখা দেয়। এই অতিরিক্ত কাজের ফলে তারা তাদের শিশুশিক্ষার দায়িত্বপূর্ণ কাজে গাফিলতি দেখাতে পারে। তাছাড়া বয়স্কদের শিক্ষা দান পদ্ধতি শিশুদের শিক্ষাদান পদ্ধতি হতে পৃথক। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানে অভ্যস্ত শিক্ষকদের পক্ষে বয়স্ক-শিক্ষাদানের পদ্ধতির সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নেওয়া দুষ্কর হয়।" এই জন্য বয়স্কদের জন্য বয়স্কশিক্ষনে শিক্ষাপ্রাপ্ত পৃথক শিক্ষক নিযুক্ত করা ভাল। কিন্তু এ ধরণের শিক্ষক পাওয়া কঠিন, বিশেষতঃ তার জন্য যথা যোগ্য পারিশ্রমিকের ব্যবস্থা না হলে। বিশ্ব শিক্ষা-বিজ্ঞান-কৃষ্টি সংস্থার সেই বিবরণীতেই বলা হয়েছে, "যদি প্রাথমিক শিক্ষকদের বয়স্ক শিক্ষার কাজে নিযুক্ত করতেই হয়, তাহলে সে শিক্ষকদের বয়স্ক শিক্ষণের বিশেষ শিক্ষা দিতে হবে। তাছাড়া বয়স্ক

শিক্ষার কাজে নিযুক্ত হওয়ার জন্য তাদিগকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিতে হবে।" তা ছাড়া যে যে গ্রামে বয়স্ক শিক্ষকদের শিক্ষার কাজ করতে হয় শিক্ষকদের সেই সেই গ্রামে বাসস্থানের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। সম্ভব ক্ষেত্রে শিশু শিক্ষার কাজ থেকে দৈনিক এক ঘণ্টা করে তাদের অব্যাহতি দিতে হবে।

আমাদের দেশে নিরক্ষর বয়স্করা যে পরিবেশে বাস করে, সেই পরিবেশও তাদের শিক্ষার পথের অন্তরায়। চারদিকে নিরক্ষর লোকদ্বারা পরিবৃত হয়ে থাকে বলে তারা শিক্ষার মূল্য উপলব্ধি করতে পারে না। সেই পরিবেশে নিরক্ষরতার জন্য তাদের মনে লজ্জা বা গ্লানিও জাগে না। যে দুচার জন লোক লেখাপড়া জানে তারাও তাদের প্রতিবেশীদের শিক্ষার প্রতি উদাসীন। এই পরিবেশও নিরক্ষরতা দূরীকরনের পথে এক বড় অন্তরায়।

ব্যাপকভাবে নিরক্ষরতা দূরীকরনের পথে বাধা যে আরও নেই তা নয়। তবে যে বাধাগুলোর উল্লেখ করা হলো সেগুলো অপসৃত হলে নিরক্ষরতা দূরীকরণের কাজ অনেকটা সহজ হবে। বাধা অপসরনের জন্য নানা উপায়ই অবলম্বন করা যায়। তার কতগুলো নিরীক্ষা সাধ্য আর কতগুলো নিরীক্ষাসিদ্ধ।

সব চাইতে বড় যে:বাধা, সে হলো শিক্ষার্থীদেরও আগ্রহের অভাব। যে সকল নিরক্ষর বয়স্ক কলকারখানায় আপীস-কাছারীতে কাজ করে তারা লেখাপড়া শিখলে যদি তাদের সামান্য কিছু অতিরিক্ত পারিশ্রমিকের ব্যবস্থা থাকে, তাহলে তারা উৎসাহ বোধ করে। নিয়োগকারীদেরও তাতে কোন ক্ষতি হয় না। অধিকতর উৎপাদন বা কর্মনৈপুণ্যের মধ্যদিয়ে নিয়োগকারীরা অতিরিক্ত পারিশ্রমিক-বাবদ যে অর্থ ব্যয় করে তা ফিরে পায়। সাক্ষরতা প্রাপ্ত বয়স্কদের জনসমক্ষে পুরস্কৃত করলে নিরক্ষর বয়স্করা শিক্ষালাভে আগ্রহান্বিত হয়। নিরক্ষর বয়স্করা সাক্ষরতা লাভ করলে তাদের সামাজিক মর্যাদা বেড়েছে দেখলেও তারা শিক্ষার কাজে আগ্রহশীল হয়।

বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রের পরিবেশ, শিক্ষাদান ব্যবস্থাও নিরক্ষরদের আগ্রহ বাড়াতে বা কমাতে পারে। শিক্ষাদান পদ্ধতি উৎকৃষ্ট হলে, কেন্দ্রে আনন্দ বিধানের ব্যবস্থা থাকলে, গৃহটি আলোবাতাস পূর্ণ হলে শিক্ষার্থীরা আগ্রহ সহকারে কেন্দ্রে আসে। এ উদ্দেশ্যে মাঝে মাঝে বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রে চিত্রপ্রদর্শন, কথকতা, কীর্তন প্রভৃতি আনন্দানুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা চলে। দিবসের ক্লান্তির পর বয়স্করা শিখতে আসে। সে সময় আনন্দের পরিবেশে শিক্ষার ব্যবস্থা থাকলে ক্লান্তির ভাবটা কমে আসে। যিনি শিক্ষাদানের কাজে নিযুক্ত, তাঁকে এসকল দিকে সব সময় লক্ষ্য রাখতে হয়। শিক্ষার্থীদের কৃষ্টিগত জীবনের বিকাশ সাধনে তাঁর দায়িত্ব অনেক। সংবাদপত্রের মাধ্যমে সুসংবদ্ধ প্রচারকার্য চালাতে হয়। চলচ্চিত্র অভিনয় ও আলোচনার মাধ্যমে বয়স্ক শিক্ষার অনুকূলে জনমত সৃষ্টি করতে হয়। তাছাড়া বয়স্ক কৃতী সদ্য-সাক্ষরদের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখ বা প্রকাশ করে তাকে সম্মান দেখালে অপরে শিক্ষায় আকৃষ্ট হয়। রাশিয়া প্রভৃতি দেশে এসকল উপায়ে খুব ভাল ফল পাওয়া গিয়েছে।

আমাদের দেশে নিরক্ষর বয়স্কদের মন জীবিকার চিন্তায় আচ্ছন্ন। সেজন্য শিক্ষার মধ্যে তারা যদি নিজেদের আয় বাড়াবার বা ব্যয় কমাবার পথ দেখতে পায়, তাহলে বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র একদিক থেকে যেমন তাদের কাছে আকর্ষণীয় হবে, অপর দিক থেকে দেশের অর্থ-নৈতিক উন্নতির পথও কিছুটা সুগম হবে। এই কারণে বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রগুলোতে ছোটখাট বৃত্তিশিক্ষার ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। মেয়েদের কেন্দ্রে বৃত্তিশিক্ষার প্রবর্তন না হলে বয়স্ক মেয়েরা এতে আসতেই চাইবে না। বাঁশের কাজ, চামড়ার কাজ, সেলাই, বোনাই প্রভৃতি শিক্ষার　　　সহজেই বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রে করা চলে।

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আক্ষরিক বা শাব্দ (verbal) স্মৃতিশক্তি কমে যায়। কিন্তু ভাবগত স্মৃতিশক্তি বেড়ে যায়। শিশু অর্থবিহীন অক্ষর বা শব্দসমষ্টি সহজে মনে রাখে। কিন্তু একটা গোটা ভাব

সহজে মনে ধরে রাখতে পারে না। অপর দিকে বয়স্ক ব্যক্তি অর্থবিহীন অক্ষর বা শব্দসমষ্টি সহজে মনে রাখতে পারে না। কিন্তু যে কোন গোটা ভাব সহজে মনে রাখতে পারে। যিনি বয়স্কদের শিক্ষা দেবেন, তাঁকে তাই মনে রাখতে হবে যেন বয়স্কদের কোন নিরর্থক অক্ষর বা শব্দ সমষ্টি কণ্ঠস্থ করতে না বলা হয়। ছোট খাট ভাব বা কাহিনীই যেন তাদের স্মৃতির উপর প্রক্ষিপ্ত হয়। একটা কথা মনে রাখা প্রয়োজন। বয়স্কদের স্মৃতিশক্তি হ্রাসে যে ক্ষতি হয়, তা পূরণ হয় তাদের বুদ্ধি-শক্তির বৃদ্ধি এবং অভিজ্ঞতার প্রসারের দরুন। সহজে একটা ভাব তাদের বোধগম্য হয়, আর পূর্ব অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়ে নিতে পারে বলে তারা নতুন জিনিস সহজে আয়ত্ত করে।

শিক্ষকদের দিক থেকে যে সকল বাধা আছে তা নিরসনের জন্য দেখা উচিত নিরক্ষরতা দূরীকরণের কাজে স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ করা যায় কিনা। দিবসের কিছুটা সময় পরহিত ব্রতে বিনা পারিশ্রমিকে নিয়োগ করতে পারে এমন আদর্শবাদী যুবকের সংখ্যা আজও আমাদের দেশে নিতান্ত কম নয়। এদের যদি কাজে উদ্বুদ্ধ করা যায় তবে এরা যে কাজ করবে, তা পারিশ্রমিকের বিনিময়ে যে কাজ পাওয়া যাবে, তার চাইতে অনেক বেশী মূল্যবান হবে।

বয়স্কশিক্ষার কাজে যাদের নিযুক্ত করা হবে তারা শিক্ষকই হোক আর স্বেচ্ছাসেবকই হোক তাদের জন্য বিশেষ ধরণের শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। যদি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদেরই একাজে নিযুক্ত করতে হয়, তাদের যথাযোগ্য পারিশ্রমিকেরও ব্যবস্থা করতে হয়। আমাদের দেশের সরকার আজকাল প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য জাতীয় পুরস্কারের ব্যবস্থা করছে। নিরক্ষরতা দূরীকরণের গুরুত্ব যখন খুব বেশী, তখন এক্ষেত্রেও শিক্ষকদের জন্য জাতীয় পুরস্কার দানের ব্যবস্থা করলে শিক্ষকরা একাজে অধিকতর আগ্রহ দেখাতে পারে। একটা কথা মনে রাখা দরকার যে যোগ্য শিক্ষকই শিক্ষাকেন্দ্রের সর্বশ্রেষ্ঠ আকর্ষণ।

নিরক্ষরতা দূরীকরণের কাজে পল্লী অঞ্চলের শিক্ষিত ব্যক্তিদের যে বড় একটা দায়িত্ব রয়েছে, সে সম্বন্ধে তাদের সচেতন করে তোলা প্রয়োজন। তারা আগ্রহশীল হলে তাদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল নিরক্ষর বয়স্করাও আগ্রহশীল হবে। শিক্ষিতগণ নিজেদের চেষ্টায় নিরক্ষরদের শিক্ষার কেন্দ্র স্থাপন করবে, মনোরম পরিবেশের ব্যবস্থা করবে, নিরক্ষর বয়স্কদের জমায়েত করবে, আর নিজেরা শিক্ষাদানের ভার না নিলেও যাতে শিক্ষাদান ভালভাবে চলে তার তদারক করবে। এসব কাজে গ্রামে গ্রামে প্রতিযোগিতার ভাব জাগাতে পারলেও কাজ হয়। এসকল কাজে সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের দায়িত্ব অনেক। অনুকূল আবহাওয়া সৃষ্টি করা তাদের পক্ষে খুব সহজ। আইন সভার সদস্যরা, পঞ্চায়েতের সভ্যরা বা অনুরূপ নেতৃবর্গ যদি একাজে এগিয়ে আসে তবে পরিবেশ সৃষ্টি করা মোটেই কঠিন হয় না।

সরকার পক্ষ থেকে আমাদের দেশে নিরক্ষরতা দূরীকরণ তথা বয়স্কশিক্ষা প্রসারের চেষ্টা চলেছে নিয়মিত ভাবে। তবুও সরকারের পরিকল্পনা রূপায়নের পথে ছোটখাট অন্তরায় ঘটে থাকে। কখনও কখনও দেখা যায় নিরক্ষরতা দূরীকরণের গুরুত্ব পূর্ণমাত্রায় স্বীকৃত হয় না বলে ব্যয় সঙ্কোচনের প্রয়োজন হলে প্রথম আঘাত পড়ে নিরক্ষরতা দূরীকরণ ব্যবস্থা বা বয়স্কশিক্ষার ব্যবস্থার উপর। এই ধরণের বিমাতৃসুলভ মনোভাব যাতে বর্জন করা সম্ভব হয়, তা দেখা প্রয়োজন।

অন্তরায় যেমন অনেক রয়েছে সমাধানও তেমন কঠিন নয়। আগ্রহের প্রয়োজন, আর প্রয়োজন পরিকল্পনার। গরজটা যখন অপরিহার্য, আগ্রহ সৃষ্টি করতে হবে, পরিকল্পনাও রচনা করতে হবে আর তাকে রূপও দিতে হবে।

(আট)

বাংলা ভাষায় বয়স্কদের আক্ষরিক শিক্ষা

শৈশবে আমরা বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রণীত বর্ণ পরিচয় এবং মদনমোহন তর্কালঙ্কার প্রণীত বাল্য শিক্ষা পড়ে বর্ণ, শব্দ এবং বাক্য আয়ত্ত করেছি। বাংলা ভাষার বর্ণগুলোকে 'স্বর' এবং ব্যঞ্জন' এই দুই ভাগে ভাগ করা রয়েছে এতে। আবার এই দু' শ্রেণীর বর্ণকে ধ্বনি বা আওয়াজ ভিত্তিক কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। ধ্বনির সাদৃশ্য বশতঃ এক সঙ্গে প্রায় সমধ্বনি যুক্ত অক্ষর বা বর্ণগুলিকে আয়ত্ত করা সহজ। শিশুরা বার বার উচ্চারণ করে সহজে তা আয়ত্ত করে। আজও আমাদের দেশের হাজার হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অ, আ, ই, ঈ প্রভৃতি স্বরবর্ণ এবং ক, খ, গ, ঘ প্রভৃতি ব্যঞ্জনবর্ণ একই মামুলী পদ্ধতিতে শিশুরা আয়ত্ত করছে। বর্ণগুলো এমন ভাবে বিন্যস্ত রয়েছে যে পৃথক ভাবে সেগুলো নিরর্থক হলেও ধ্বনিসাদৃশ্য বশতঃ মনে যে গুঞ্জন সৃষ্টি করে সে গুঞ্জন স্থায়ী হয়ে যায়। স্মৃতির পটে সেগুলো সারিবদ্ধভাবে নিবদ্ধ হয়ে যায়; এই মামুলী পদ্ধতির নাম বর্ণপরিচয় পদ্ধতি।

এই পদ্ধতিতে কেবল যে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষাদান হয় তা নয়। আমাদের অনেক বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রেও এই পদ্ধতিতেই শিক্ষাদান কাজ চলে। এর একটি কারণ হলো, সকল শিক্ষক বিশেষ ধরনের শিক্ষালাভ করেনি। তা ছাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিশুশিক্ষা দানের বেলা মামুলী পদ্ধতিতে শিক্ষাদান করে সন্ধ্যায় আবার অন্য পদ্ধতি অবলম্বন করতে নারাজ হয়। বয়স্কদের ক্ষেত্রে এ পদ্ধতি একেবারে অচল, তেমন কথা বলা চলে না। বাস্তবিক পক্ষে বহুক্ষেত্রে এতে কাজের সুফলই পাওয়া গেছে।

মামুলী পদ্ধতিতে বিশেষ করে বয়স্কদের ক্ষেত্রে কিছুটা ত্রুটি

আছে। পৃথক ভাবে বর্ণগুলো অর্থবিহীন বলে বয়স্করা সহজে তা মনে রাখতে পারে না। পাশাপাশি একটির সঙ্গে অন্যটির সাধারণত আকৃতিগত সাদৃশ্য না থাকার ফলে অনুষঙ্গের (association) সাহায্যেও এক সঙ্গে কয়েকটি তারা মনে রাখতে পারে না। 'ফ' এবং 'ল' এর পৃথক ভাবে কোন অর্থ নেই। কেবল মাত্র দেখে এর কোনটা সহজে নিরক্ষর বয়স্ক ব্যক্তি মনে রাখতে পারে না। অথচ এক সঙ্গে ফল কথাটা দেখে এবং শুনে মনে রাখা তাদের পক্ষে সহজ হয়।

পাশাপাশি বর্ণগুলোর সাধারণত একটির সঙ্গে অপরটির আকৃতিগত সাদৃশ্য নেই বলে অনুষঙ্গের (association) সাহায্যে এক সঙ্গে কয়েকটি তারা মনে রাখতে পারে না। 'ক' এর সঙ্গে 'খ' এর আর 'খ' এর সঙ্গে 'গ' এর আকৃতিগত সাদৃশ্য বড় কম। কাজেই একটির আকৃতি মনে রেখে পাশাপাশি বর্ণগুলোর পরিচয় মনে রাখা সহজ নয়। কিন্তু 'ব' এর সঙ্গে 'ক' এর এবং 'র' এর আকৃতিগত সাদৃশ্য আছে। ফলে মামুলী পদ্ধতিকে বাদ দিয়ে যদি একজন বয়স্কের কাছে এক সঙ্গে এ তিনটি উপস্থাপিত করা হয়, তবে সহজে সে অনুষঙ্গ পদ্ধতিতে এগুলো মনে রাখতে পারে, এবং অবরোহ প্রণালীতে (Deduction process) একটি লিখতে শিখলে সহজে আর একটি লিখতে শিখে। মামুলী পদ্ধতিতে এ সুবিধা নেই।

বর্ণপরিচয় পদ্ধতিতে কেবলমাত্র বর্ণমালা শিক্ষা দিতেই প্রায় তিন চার মাস সময়ের প্রয়োজন হয়। এ ধরণের কালক্ষেপ শিশুদের পক্ষে ক্ষতিদায়ক নয়। কিন্তু বয়স্কদের ক্ষেত্রে এধরণের কালক্ষেপ মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। তার একটি কারণ হলো বয়স্কদের সময়ের অভাব। দ্বিতীয় কারণ হলো কোন কিছু আয়ত্ত করতে সময় একটু বেশী লাগলে তারা সহজে আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলে, নিরুৎসাহ হয়ে যায়। নিরুৎসাহ হয়ে গেলে বয়স্ক শিক্ষার কাজ অচল হয়।

বর্ণগুলোর আকৃতিগত সাদৃশ্যকে ভিত্তি করে বয়স্কদের লিখতে পড়তে শিখান যেতে পারে। 'ব' 'ক' 'র' 'ধ' এ চারটি বর্ণ এবং

তাদের সাহায্যে গোটা কয়েক শব্দ লিখানো একদিনের চেষ্টাতেই সম্ভব। এতে পারম্পর্য রক্ষা করে কয়েকটি বর্ণকে এক সঙ্গে মনে রাখার কসরৎ করতে হয় না। বর্ণগুলোর মধ্যে প্রথমে যে আকৃতিগত সাদৃশ্য রয়েছে তা দেখিয়ে পরে বৈসাদৃশ্যটা দেখিয়ে পৃথক নামকরণ করে দিয়ে কয়েকবার শিক্ষক নিজে উচ্চারণ করে শিক্ষার্থীদের দিয়ে উচ্চারণ করিয়ে নেওয়া চলে। তার পরই তুটো বর্ণ একসঙ্গে যুক্ত করে দিয়ে একসঙ্গে উচ্চারণ করলে তারা শব্দ আয়ত্ত করতে পারে। 'ব' এর সঙ্গে 'ক', 'ক'এর সঙ্গে 'র' যুক্ত করে দিয়ে একসঙ্গে 'বক' আর 'কর' উচ্চারণ করা যায়। এমনি করে একদিনে চারটি অক্ষর এবং তার সাহায্যে দশটি শব্দে শিখানো খুব একটা কঠিন কাজ নয়। একদিনের শিক্ষাটাকে পর দিন আবার ঝালাই করে নিয়ে ঐ অক্ষর দিয়ে আরও নতুন শব্দ তৈরী করা যায়।

এই পদ্ধতির সুবিধা আছে কয়েকটি। এতে কণ্ঠস্থ করার কসরৎ নেই। অক্ষরগুলোর পারম্পর্য রক্ষার কোন প্রয়োজন নেই। শিক্ষার্থী এক দিনে যা শিখতে পারে তার সহজ একটা পরিমাপ হয়। কয়েকটি শব্দ শিখতে পারলে শিক্ষার্থী সাফল্যের আনন্দে উৎসাহিত হয়। অধিক থেকে অধিকতর চেষ্টা তার পক্ষে স্বাভাবিক হয়। নতুন করে শিখতে যাওয়াটা অসম্ভব বলে যে আশঙ্কা নিরক্ষর বয়স্কের মনে স্বভাবতঃ জেগে থাকে। একদিনে সে আশঙ্কা অমূলক বলে প্রমাণিত হয়। আর একটি সুবিধা হল বয়স্করা তাদের নিজ পুত্র-কন্যার সঙ্গে একই পদ্ধতিতে না শিখে পৃথক পদ্ধতিতে শিখে বলে মনে কম সঙ্কোচও থাকে, তাছাড়া এ পদ্ধতির সাহায্যে লেখা এবং পড়া একই সঙ্গে চলতে পারে। এসকল সুবিধার জন্য কোন কোন শিক্ষক এ পদ্ধতি অবলম্বন করে থাকেন।

ডক্টর ফ্রাঙ্ক সি, লাওব্যাক বয়স্ক নিরক্ষরদের জন্য হিন্দী ভাষায় একখানা প্রথম পাঠ রচনা করেছেন। তিনি ছবির সাহায্যে অক্ষর-পরিচয় ঘটাবার চেষ্টা করেছেন এতে। হিন্দিতে 'আ' অক্ষরটা

প্রথম শিখাবার চেষ্টা করেছেন তিনটি পাতা যুক্ত একটি আম এঁকে। ছবিটি দেখলেই শিক্ষার্থীর মনে আম কথাটি জাগবে। তাছাড়া ছবিটাকে 'আ' অক্ষরটার সঙ্গে সাদৃশ্য রেখে আঁকা হয়েছে। ছবির সঙ্গে 'আ' অক্ষরের আকৃতিগত মিল থাকার ফলে অক্ষরটা মনে রাখা সহজ হবে। অক্ষরটার সঙ্গে অপর একটি অক্ষর 'ম' যোগ করে আম শব্দটি গঠন করা হয়েছে। তারই সঙ্গে আরও পরিচিত এক বা একাধিক শব্দ জুড়ে দিয়ে ছোট ছোট বাক্য রচনা করা হয়েছে। প্রত্যেকটি শব্দ যেমন 'আম' কয়েকটি বাক্যের মধ্যে অন্ততঃ পাঁচ বার ব্যবহার করা হয়েছে। প্রতিটি বাক্যের সঙ্গে একখানা ছবি জুড়ে দিলে শিক্ষার্থী ছবি দেখবে এবং পড়বে। এমনি করে ছবি দেখে বয়স্করা শব্দের সঙ্গে এবং অক্ষরের সঙ্গে পরিচিত হতে পারে।

এই পদ্ধতি সম্বন্ধে একটি কথা প্রথমেই মনে রাখতে হবে যে এক্ষেত্রে শিক্ষক অপেক্ষা পাঠ্য বইখানিই বড় সহায়ক। অতি যত্নসহকারে উদ্ভাবনী শক্তি প্রয়োগ করে এধরণের বই তৈরী করতে হবে। আজও এধরণের নির্ভর যোগ্য বয়স্কদের বই বাংলা ভাষায় তৈরী হয় নি।

ডক্টর ফ্র্যাক সি, লাওব্যাক বয়স্ক নিরক্ষরদের লেখা-পড়া শেখাবার সঠিক পদ্ধতি আবিষ্কারের জন্য নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা বা গবেষণা করেছেন। নিরীক্ষালব্ধ একটি পদ্ধতির নাম মুলশব্দ পদ্ধতি বা Key word Method. প্রত্যেক ভাষায় এমন শব্দসমষ্টি রয়েছে যা আয়ত্ত করতে পারলে সেই ভাষার সব কথা বুঝতে বা লিখতে পারা যায়। এই শব্দ সমষ্টিকে মূল শব্দাবলী বা Basic words বলা হয়। মূল শব্দপদ্ধতিতে এই শব্দ সমষ্টি থেকে গোটা দশেক শব্দ বাছাই করে নিয়ে তার সাহায্যে বয়স্কদের শিক্ষা দেবার চেষ্টা করা হয়েছে। বাংলা ভাষায় মোট হাজারখানেক শব্দ নিয়ে মূল শব্দ সমষ্টি গঠিত বলে মনে করা যায়। এগুলোর সাহায্যেই বাংলার ভাব গ্রহণ বা প্রকাশ সম্ভব

হয়। এই হাজার শব্দ থেকে দশটি শব্দ এমন নিপুণভাবে বেছে নিতে হবে যাতে পৃথক পৃথক অক্ষরগুলোকে নানাভাবে বিন্যস্ত করে ধীরে ধীরে সব কটি মূলশব্দ আয়ত্ত করা সম্ভব হবে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ একটি শব্দ নিতে পারি—'কলম'। এই শব্দটির অন্তর্গত বিভিন্ন অক্ষর 'ক' 'ল' এবং 'ম'। তারই সঙ্গে একটি 'আ' বা 'া' বিভিন্ন ভাবে বিন্যস্ত করলে 'কল' কম, মল, কমল, মলম, কলা, কালা, লাল, কমলা, মালা, কাক, মামা প্রভৃতি অনেক শব্দ গঠন করা যায়। তেমনি আর একটি মূল শব্দ নেওয়া যেতে পারে, যেমন পাতাল'। এ শব্দেরও বিভিন্ন অক্ষরকে বিভিন্নভাবে বিন্যস্ত করলে নানা শব্দ গঠিত হয়, যার সাহায্যে বাঙালীর ভাব প্রকাশ বা গ্রহণ সহজ হয়। এভাবে যদি শিক্ষার্থীরা প্রথম এই কলম আর পাতাল দুটো শব্দ আয়ত্ত করতে পারে এবং সঙ্গে সঙ্গে এগুলোর অন্তর্গত অক্ষরগুলো আয়ত্ত করতে পারে, তাহলে তারা বহু শব্দ আয়ত্ত করতে পারে। এমনি ভাবে গোটা মূলশব্দ সমষ্টি শিক্ষার্থীর আয়ত্ত হয়।

শিক্ষক বড় করে বোর্ডের উপর একটি শব্দ 'কলম' লিখে দেখাতে পারেন। তারপর তার আলাদা আলাদা অক্ষরগুলি দেখতে পারেন। তারপর খেলার ছলে অক্ষরগুলোকে নানা ভাবে বিন্যস্ত করে শিক্ষার্থীদের সাহায্যে নানা শব্দ গঠন করতে পারেন। মামুলী পদ্ধতির শুরুতেই কতগুলো অর্থবিহীন অক্ষর 'মুখস্থ করার যে বিড়ম্বনা তা থেকে শিক্ষার্থীরা এখানে রক্ষা পায়। কিছুটা আয়ত্ত হলে শিক্ষার্থীরা নিজেরাই অক্ষর বিন্যাসের সাহায্যে নানা শব্দ গঠন করতে পারে। ডক্টর লাওব্যাক এই পদ্ধতি প্রয়োগ করে বেশ ফল পেয়েছেন। বাংলাদেশের বয়স্ক শিক্ষাসংঘের সম্পাদক শ্রীবিলাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ও এ পদ্ধতিতে বয়স্ক শিক্ষার কাজ করেছেন এবং তিনি এধরণের বইও লিখেছেন।

আর একটি পদ্ধতির নাম বাক্যক্রমিক পদ্ধতি, (Sentence Method)। শিক্ষাবিদ্‌গণ মনে করেন যে এই পদ্ধতি বেশ বিজ্ঞান

সম্মত এবং আশুফলপ্রসূ। বাক্যক্রমিক পদ্ধতি একটি মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। কোন একটি বস্তু যখন আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় তখন সর্বপ্রথম তার অখণ্ড রূপটি আমাদের মনকে অধিকার করে। তাকেই অনুসরণ করে একটি ভাব, আর সেই ভাবই প্রকাশ পায় বাক্যে। বস্তুর দর্শনে মনে যে পূর্ণাঙ্গ ভাবের উদয়, সম্পূর্ণ বাক্যে তার প্রকাশ।

বাক্যক্রমিক পদ্ধতিতে প্রথমেই বাক্য নিয়ে পাঠদান শুরু হয়। ছোট একটি বাক্য শিক্ষার্থীকে পাঠ করান হয়। সঙ্গে সঙ্গে হয় তার অর্থবোধ। পাঠের সঙ্গে সঙ্গে অর্থবোধ হয় বলে শিক্ষার্থী মনে উৎসাহ বোধ করে। শিক্ষার কাজ সহজ হয়। একটি বাক্য আয়ত্ত হয়ে গেলে তার অন্তর্গত শব্দগুলো পৃথকভাবে আয়ত্ত হয়। তারপর শব্দের অন্তর্গত অক্ষরগুলো আয়ত্ত হয়। মনের মধ্যে যে রূপে ভাব, বাক্য, শব্দ, অক্ষর বিকশিত হয়, এই বাক্যক্রম পদ্ধতি তদনুসারী বলেই এটিকে স্বাভাবিক পদ্ধতি বলে বলা হয়। কোন কোন বয়স্ক কেন্দ্রে এ পদ্ধতিও অবলম্বন করা হয়।

বয়স্ক শিক্ষার জন্য পশ্চিমবঙ্গে যে সকল পদ্ধতি অবলম্বন করা হচ্ছে বা হতে পারে, তার কিছুটা আলোচনা করা হল। একথা সত্য যে এখনও পরীক্ষা নিরীক্ষার অবকাশ রয়েছে। নতুনতর পদ্ধতি আবিষ্কৃত হবার সম্ভাবনা রয়েছে। শিক্ষকগণ নিজ নিজ সুবিধা অনুসারে পৃথক পৃথক পদ্ধতি অবলম্বন করেন। কখনও কখনও একাধিক পদ্ধতির সাহায্যও তাঁরা নেন। বুদ্ধিমান শিক্ষক অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে পদ্ধতিরও পরিবর্তন সাধন করেন। মোদ্দাকথা হল, বিচক্ষণ শিক্ষকের নিজ পদ্ধতিই উৎকৃষ্ট পদ্ধতি।

(নয়)

সাক্ষরতার ন্যূনতম মান কি (Functional litera

আজও আক্ষরিক শিক্ষার সর্বজনস্বীকৃত কোন মান নির্দিষ্ট হয়নি। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন মান মেনে নেওয়া হচ্ছে। আবার একই দেশে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মান নির্দিষ্ট হয়ে থাকে। কতখানি লেখা পড়া শিখলে কোন এক ব্যক্তিকে আক্ষরিক-জ্ঞান-সম্পন্ন বলে মেনে নেওয়া যায় তার একটা স্থিরতা থাকলে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে, রাজ্যে রাজ্যে বা দেশে দেশে এর একটা তুলনামূলক বিচারও করা যায়। জাতি সঙ্ঘের (United Nations) জনসংখ্যা কমিশনের নির্দেশ অনুসারে যে কোন ভাষায় একটা সাধারণ সংবাদ লিখতে বা পড়তে পারলেই কোন ব্যক্তিকে সাক্ষর বা অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন বলে মেনে নেওয়া যেতে পারে। অনেক দেশে এটাকেই সাক্ষরতার মান বলে ধরে নেওয়া হয়েছে। কোন কোন দেশে কেবল নাম স্বাক্ষর করতে পারলেই কোন ব্যক্তিকে সাক্ষর বলে মনে করা হয়। ব্রহ্মদেশ, ভারত এবং সিংহলের মান একটু উঁচুতে। এ সকল দেশে যারা তাদের বন্ধুবান্ধব আত্মীয় স্বজনের কাছে চিঠি লিখতে পারে এবং তার জবাব পড়তে পারে, তাদের অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন বলে মনে করা হয়। উনিশ শ' একষট্টি সালের সেন্সাস বা আদমশুমারে যারা উপলব্ধি সহকারে লিখতে পড়তে পারে তাদেরই সাক্ষর বলে গণ্য করা হয়েছে। বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে অনুপাত স্থির করার জন্য মানটাকে আরও একটু উন্নত করে ধরা হয়েছে। যারা লিখতে পড়তে পারে এবং সাধারণ রকমের একটু লিখিত পরীক্ষা পাশ করতে পারে, তাদেরই এই অনুপাতের উদ্দেশ্যে সাক্ষর বলে গণ্য করা হয়েছে।

সাক্ষরতার মান স্থির করতে হলে দুটো কথা বিবেচনা করা দরকার। প্রথম হচ্ছে কোন ব্যক্তি যে এলাকায় বাস করে জীবিকা

অর্জন করে সে এলাকার প্রয়োজন। আর দ্বিতীয় হচ্ছে জাতির দীর্ঘকালীন প্রয়োজন। কোন একটি অঞ্চলে বহিরাগত শ্রমিকরা বাস করে এবং সেখানকার কলকারখানায় তারা কাজ ক'রে জীবিকা অর্জন করে। সে এলাকার লোকদের গরজ হলো নিজ পরিবার পরিজনের সঙ্গে পত্রের মাধ্যমে সংবাদ আদান প্রদান করা আর নিজের উপার্জন এবং ব্যয়ের মোটামুটি হিসাব রাখা। যে বহিরাগত শ্রমিক একাজ সম্পাদন করতে পারে, তার লেখাপড়াগত ন্যূনতম গরজ মিটে যায়।

আবার কোন দেশে গণতন্ত্র প্রবর্তিত হয়েছে। দেশে উন্নয়নমূলক বহু কর্মসূচী গ্রহণ করা হচ্ছে। সেই দেশের নাগরিকদের গণতন্ত্রে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করার জন্য তাদের অধিকার তাদের দায়িত্ব প্রভৃতি সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান থাকা চাই। তাদের নানা ধরনের উন্নয়নমূলক কার্যের উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি প্রভৃতি সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা চাই। এদের সাক্ষরতার নিম্নতম মান হচ্ছে উপলব্ধি সহকারে পড়ে নিজ কর্তব্য এবং অধিকার, উন্নয়নমূলক নানা কাজের উদ্দেশ্য এবং পদ্ধতি প্রভৃতি সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণের যোগ্যতা, আর লিখে সেগুলি প্রকাশ করার ক্ষমতা। যতখানি লিখতে পড়তে শিখলে তারা এই যোগ্যতা অর্জন করতে পারে ততখানিকেই বলা যাবে তাদের সাক্ষরতার নিম্নতম মান। এক কথায় বলা যায় এটা হচ্ছে লেখাপড়ার সাহায্যে নিজ পরিবেশ এবং অবস্থায় কাজ চালিয়ে নেওয়ার যোগ্যতা। এটাকে ইংরেজীতে বলা হয় Functional Literacy। আমরা বলতে পারি ব্যবহারিক সাক্ষরতা।

শিশুরা চার কি পাঁচ বৎসর কাল বিদ্যালয়ে পাঠাভ্যাস করলে মোটামুটি স্থায়ী রকমের ব্যবহারিক সাক্ষরতা অর্জন করতে পারে। শিক্ষা বিশেষজ্ঞ সার ফিলিপ হার্টগের মতে চার বৎসর কাল প্রাথমিক শিক্ষা পেলে একটি শিশু মোটামুটি স্থায়ীভাবে ব্যবহারিক অক্ষরজ্ঞান লাভ করতে পারে। আজকাল বিদ্যালয়ের কর্মসূচীতে নানা ধরনের

কাজের ব্যবস্থা রয়েছে বলে মনে করা যেতে পারে যে পাঁচ বছর কাল প্রাথমিক শিক্ষা পেলে একটি শিশু ব্যবহারিক ভাবে অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন হতে পারে। তাহলে তারা নিজেদের পরিবেশ এবং অবস্থানুযায়ী প্রয়োজনীয় তথ্য পড়ে জানতে পারে বা লিখে প্রকাশ করতে পারে। তারা মোটামুটি লিখতে পড়তে ও হিসাব রাখতে পারে। বয়স্কদের পক্ষে ঠিক এই মানের সাক্ষরতাই ন্যূনতম প্রয়োজন বলে মনে করা যেতে পারে।

শিশুদের যে সাক্ষরতা আয়ত্ত করতে বা অর্জন করতে পাঁচ বছর সময় লাগে, বয়স্ক ব্যক্তির পক্ষে সে মানের সাক্ষরতা অর্জন করতে কত সময় লাগবে এক্ষেত্রে স্বভাবতই এ প্রশ্ন উঠতে পারে। এ প্রশ্নের একটা যথাযথ উত্তর দেবার আগে কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ প্রয়োজন। শিক্ষার কাজে সহায়তা করে স্মৃতিশক্তি, বুদ্ধিবৃত্তি, অভিজ্ঞতার পরিসর আর আয়ত্ত-করা শব্দ সম্ভার।

আমরা সাধারণ কথায় বলে থাকি শিশু অপেক্ষা বয়স্ক ব্যক্তির স্মৃতিশক্তি কম। একটু পরীক্ষা করলে দেখা যাবে কথাটা পূর্ণসত্য নয়। শিশুর শব্দানুসারী স্মৃতিশক্তি সত্যই বয়স্কদের চাইতে প্রবল। কথা, তা অর্থপূর্ণ হোক আর নিরর্থক হোক, শিশু সহজে মনে রাখতে পারে। সেজন্যই তারা বর্ণমালা সহজে আয়ত্ত করতে পারে। আবার ভাবের দিক থেকে দেখতে গেলে দেখা যায় বয়স্করা সহজে একটা ভাব মনে রাখতে পারে। তাদের ভাবানুসারী স্মৃতিশক্তি শিশুদের ভাবানুসারী স্মৃতিশক্তির চাইতে প্রবল। অর্থপূর্ণ কথা তারা শিশু অপেক্ষা সহজে গ্রহণ করতে এবং ধরে রাখতে পারে। কাজেই স্মৃতিশক্তির দিক থেকে বিশেষ পার্থক্যের কোন কারণ নেই। এক দিকের লাভ অন্য দিকের ক্ষতি পূরণ করে।

শিশুদের বুদ্ধিবৃত্তি অপেক্ষা বয়স্ক ব্যক্তির বুদ্ধিবৃত্তি পরিণত। শিশু নির্বিচারে গ্রহণ করে। আর বয়স্ক ব্যক্তি বুদ্ধির সাহায্যে বিচার করে গ্রহণ করে। বিচারের একটা সুসঙ্গত ধারা মনে ধীরে ধীরে

তাদের বিকাশ লাভ করে। শিশুর কাছে যে জিনিষ দুর্বোধ্য বয়স্কের কাছে অনেক ক্ষেত্রে তা দুর্বোধ্য নয়। বয়স্ক ব্যক্তি বুদ্ধির সাহায্যে সহজে একটা যুক্তিপূর্ণ ভাব বা বিষয় গ্রহণ করতে পারে। প্রকাশও করতে পারে।

শিশুর অভিজ্ঞতার পরিধি অপেক্ষা বয়স্ক ব্যক্তির অভিজ্ঞতার পরিধি বেশী। শিক্ষার ক্ষেত্রে দেখা যায় জ্ঞাত বস্তুর সঙ্গে জ্ঞাতব্য বস্তুর তুলনা করলে জ্ঞাতব্য বস্তু সহজে আয়ত্ত হয়। যার অভিজ্ঞতা বেশী তার অভিজ্ঞতার সঙ্গে জ্ঞাতব্য বস্তুকে সে সহজে তুলনা করে। জ্ঞাতব্য বস্তু সহজে তার আয়ত্ত হয়। যারা তেরশ' পঞ্চাশের মন্বন্তর দেখেছে ইতিহাস পড়াতে গিয়ে ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের ভয়াবহতা তাদের বোঝান বড় একটা কঠিন কাজ নয়। কিন্তু তেমন কোন মন্বন্তরের অভিজ্ঞতা যাদের নেই তাদের এই ভয়াবহতা বোঝান একটু সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। অভিজ্ঞতার দরুণ বয়স্করা সহজে জ্ঞাতব্য বিষয় আয়ত্ত করতে পারে।

সর্বশেষ বলা যায় শিশুদের জানা শব্দভাণ্ডারের আয়তন ক্ষুদ্র। পক্ষান্তরে বয়স্কদের জানা শব্দভাণ্ডারের আয়তন বেশ বড়! ফলে বয়স্ক ব্যক্তির কাছে কোন বিষয় পরিবেশন করতে হলে শব্দানুধাবন সংক্রান্ত বাধা অনেক কম। সাধারণ বর্ণনা তারা সহজে গ্রহণ করতে পারে।

এই আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারি শিশুর শিক্ষায় যে সময় লাগে, বয়স্ক ব্যক্তির তদপেক্ষা বেশ কম সময় লাগে। তার শিক্ষার কাজে তাকে সহায়তা করে তার ভাবানুসারী স্মৃতিশক্তি, বুদ্ধিবৃত্তি, অভিজ্ঞতা এবং শব্দভাণ্ডারের পরিধি। যাঁরা এই নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন তাঁরা বলেন শিশুদের যা আয়ত্ত করতে পাঁচ বছর সময়ের প্রয়োজন হয় বয়স্কদের তা আয়ত্ত করতে দেড়বছর থেকে দু'বছর সময় লাগে। আমাদের পশ্চিমবঙ্গের বয়স্ক শিক্ষা-কেন্দ্রগুলির অভিজ্ঞতাও এই সিদ্ধান্তকে সমর্থন করে।

সহজ নির্ণয়যোগ্য কয়েকটি কুশলতা অর্জন করলে একজন বয়স্ককে কাজ চালাবার মত সাক্ষর হয়েছে বলে ধরা যেতে পারে। সেই কুশলতাগুলোর সংক্ষেপ উল্লেখ এখানে প্রয়োজন।

পড়ার সময় প্রতিটি শব্দকে বানান করে পড়া চলে। কখনও কখনও অর্থপূর্ণ শব্দ সমাবেশে বা বাক্যে দু'একটি শব্দ অনুমানেও পড়া চলে। এধরনের পড়ায় সময় বেশী লাগে এবং ভ্রান্তির আশঙ্কা থাকে। ব্যবহারিক সাক্ষরতার মানের চাইতে এ সাক্ষরতার মান নিম্নে। যখন দেখা যায় কোন ব্যক্তি অযথা সময় নষ্ট না করে এবং অনুমানের উপর নির্ভর না করে প্রতিটি শব্দ দেখে চিনতে পারে তখনই বলা যেতে পারে যে পড়ার দিক থেকে তার সাক্ষরতার মান ব্যবহারিক পর্যায়ের। লিখবার দিকও ঠিক অনুরূপ। যে ব্যক্তি প্রতিটি শব্দের বিভিন্ন বর্ণকে পৃথক ভাবে মনে উচ্চারণ না করে এবং অযথা সময় নষ্ট না করে নিজের ভাবটা লেখায় প্রকাশ করতে পারে তাকে লেখার দিক থেকে ব্যবহারিকভাবে সাক্ষর হয়েছে ধরা যেতে পারে।

কেবল পড়তে পারলেই কাজ চলে না। আপন পরিবেশের প্রয়োজনীয় সকল কথা, নিজ জীবিকা সংক্রান্ত সকল কথা সহজবোধ্য ভাষায় লেখা থাকলে তা যদি পড়ে কোন ব্যক্তি বুঝতে পারে তাহলে বুঝা যাবে সে ব্যক্তি ব্যবহারিকভাবে সাক্ষর হয়েছে। কেবল পড়লেই হবেনা, অধীত বিষয়টা হৃদয়ঙ্গমও করতে হবে। সবটা হয়ত সম্যক-রূপে অনুধাবন সহজসাধ্য হবেনা। কিন্তু তার অধিকাংশই বোধগম্য হওয়া চাই। তবেই তার পড়া কার্যকরী হবে অর্থাৎ পাঠের দিক থেকে তার সাক্ষরতা ব্যবহারিক হবে।

পড়ে যা জানা যায় তাকে কাজে লাগাতে হলে অধীত বস্তুর মুল্য নির্ণয় করাও প্রয়োজন। আগে যা জেনেছি বা শুনেছি তার সঙ্গে নতুন পড়া বিষয়ের তুলনা করে তা গ্রহণযোগ্য কি বর্জনীয় তা বুদ্ধির সাহায্যে বিচার করা যায়। মুদ্রিত আকারে বহু তথ্য আর নির্দেশ প্রচারিত হয়। সেই তথ্য আর নির্দেশ তখনই পাঠকের কাজে লাগে

যখন সেগুলো বিচারসহ হয়। কার্যকরী ভাবে সাক্ষর ব্যক্তি পড়ে বিচার করে। তার পর তা গ্রহণ বা বর্জন করতে পারে।

পাঠের মাধ্যমে মানুষ যা জানতে পারল তা দিয়ে যদি তার আচার আচরণ বা বৃত্তি সুগঠিত বা মার্জিত না হয়, তাহলে সে জ্ঞান তার কাছে অর্থহীন হয়। তা কার্যকরীও নয়। একটি লোক ব্যবহারিকভাবে সাক্ষর বলে অভিহিত হবে তখন, যখন পঠিত বিষয় তার স্বভাব, আচার, আচরণের উপর একটা প্রভাব বিস্তার করে।

শেষ কথা হল ন্যূনতম মানের কাজ চালাবার মত লেখাপড়া মানুষের মনে অধিকতব জ্ঞানের স্পৃহা জাগিয়ে দেয় এবং সেই স্পৃহার ফলে মানুষ আরও পড়তে আগ্রহান্বিত হয়। এই আগ্রহের ফলে অধিকতর অধ্যয়নে সে ব্রতী হয়।

যে ন্যূনতম মানের কথা বলা হল, সে মান শিক্ষায় অনুন্নত দেশ-গুলির পক্ষে একটু উচ্চ, একথা অস্বীকার করার জো নেই। কারণ সে মানে পৌছান সে সকল দেশের পক্ষে খুব সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। তথাপি এ কথাও অস্বীকার করাব উপায় নেই যে, লেখাপড়া থেকে নিজ পরিবেশে এবং জীবিকার ক্ষেত্রে কোন উপকার পেতে হলে মানটাকে এতখানি উঁচুতেই রাখতে হবে।

(দশ)

রাশিয়া কি উপায়ে নিরক্ষরতা দূর করল

আঠারশ’ সাতানব্বই খৃস্টাব্দে রাশিয়ার আদমশুমারের বিবরণী থেকে দেখা গেল নয় বছরের উর্ধ্বে শতকরা ছত্রিশ জন পুরুষ আর শতকরা বারজন নারী লিখতে পড়তে পারত। বাকী সব ছিল নিরক্ষর। রাশিয়ার উত্তর এবং পূর্ব অংশের অবস্থা ছিল আরও শোচনীয়। সে অঞ্চলে কোথাও কোথাও অক্ষর-জ্ঞান-সম্পন্ন ব্যক্তির শতকরা হার ছিল ছয় কি সাত। তার পর বিশ বৎসর উত্তীর্ণ হল। এর মধ্যে শিক্ষার অবস্থা উন্নত হয়নি, শিক্ষিতের হারও বাড়ে নি। যদিও কিছু বেড়ে থাকে মন্থর গতিতে। শেষের দিকে দেখা গেল গোটা রাশিয়ায় মোট এক কোটির অল্প কিছু বেশী ছাত্র-ছাত্রী বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করছে। বয়স্ক শক্ষার যে একটা ব্যবস্থা ছিলনা তা নয়। তবে সে ব্যবস্থা প্রয়োজনের তুলনায় খুব কম ছিল। উনিশশ’ পাঁচ সালে বয়স্কশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ছিল এক হাজারের কিছু বেশী, আর তাতে বয়স্ক শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল প্রায় সত্তর হাজার।

রাশিয়ার বিপ্লবের অব্যবহিতকাল পরেই শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার সাধনের এক প্রচণ্ড তাগিদ এলো। শিক্ষকদের অবস্থা উন্নয়নের ব্যবস্থা হলো। বিদ্যালয়ের সংখ্যা প্রচুর পরিমাণে বাড়িয়ে দেওয়া হলো। ছাত্রছাত্রীদের জন্য বিনা মূল্যে মধ্যাহ্ন আহার, বস্ত্র এবং পাদুকা সরবরাহের ব্যবস্থা হলো। রাজকোষ থেকে শিক্ষার জন্য প্রভূত অর্থ ব্যয় করা হলো। বিদ্যালয় বহির্ভূত শিক্ষার উপরও বেশ নজর দেওয়া হলো। বহু গ্রন্থাগার, ক্লাব এবং বয়স্কদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হলো। অবসর সময়ে প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং উচ্চ বিদ্যালয়ের গৃহগুলো বয়স্কশিক্ষার কাজে লাগাবার নির্দেশ দেওয়া হলো।

সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য আইন প্রণয়ন এবং ব্যাপক অভিযান। উনিশশ' উনিশ সালে লেনিনের নেতৃত্বে নিরক্ষরতা দূরীকরণ আইন প্রণয়ন হলো। তাতে বলা হলো আঠার থেকে পঞ্চাশ বছর বয়সের সকল নরনারীকে লিখতে পড়তে শিখতে হবে। শিক্ষাদান কাজ চলবে চালু বিদ্যালয়গুলিতে অথবা নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য নতুন-করে-স্থাপন-করা বিদ্যালয়ে। শিক্ষালাভ বাধ্যতামূলক। কিন্তু বাধ্যতাটা নৈতিক।

কাজ আরম্ভ হলো অভূতপূর্ব উৎসাহ আর উদ্দীপনা নিয়ে। শিক্ষকতার কাজে এগিয়ে এলো শিক্ষকরা, আপীসের কর্মচারীরা, বিদ্যালয়ের উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রেরা, কলকারখানার লেখাপড়া জানা শ্রমিকরা আর সৈন্য বাহিনী থেকে কর্মমুক্ত লোকেরা। সাধারণ শিক্ষকদের যা বেতন দিতে হত, এসকল কর্মীদেরও সে বেতন দেওয়া হলো। আর যারা নিরক্ষরতা দূরীকরণের বিদ্যালয়ে পাঠ গ্রহণের জন্য ভর্তি হলো তাদেরও নানা ধরণের সুবিধা দেওয়া হলো। শ্রমিকদের পারিশ্রমিকের পরিমাণ না কমিয়ে কাজের সময় কমিয়ে দেওয়া হলো, যাতে তারা ঐ অবসর সময়টা লেখাপড়া শেখার কাজে লাগাতে পারে। ক্ষেত-খামারে কলকারখানায় যারা কাজ করে, তারা লিখতে পড়তে শিখলে তাদের পারিশ্রমিকের হার বাড়িয়ে দেওয়া হলো। আপীসে কলকারখানায় নিরক্ষরদের পড়াশুনার জন্য পৃথক কক্ষ নির্দিষ্ট হলো। যারা নিরক্ষরদের পাঠদান কাজে বাধাদানের চেষ্টা করে তাদের শাস্তির ব্যবস্থা হলো।

নিরক্ষরতা দূরীকরণ আইনের লক্ষ লক্ষ অনুলিপি ছাপিয়ে প্রচার করা হলো। বহু প্রচারপত্র মুদ্রিত হলো। লোকদের কাছে ব্যাপক আবেদন জানান হলো। নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে ধ্বনি তোলা হলো। রব উঠল—যে কোন উপায়ে লোকেদের লিখতে পড়তে শিখাও। নিরক্ষরদের নামের তালিকা তৈরি হলো। শিক্ষকদেরও নামের তালিকা তৈরি হলো। শিক্ষকদের জন্য বিশেষ

ধরণের শিক্ষক-শিক্ষণের ব্যবস্থা হলো। যারা একটু লিখতে পড়তে শিখল তারা অপরদের শিখাবার জন্য পরম আগ্রহে প্রচারকার্য চালাতে লাগল। তারা ছাত্র ভর্তি করতে লাগল। একটা অভূতপূর্ব সাড়া জেগে গেল। নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে অভিযানের ভিত্তি হলো জনসাধারণের আত্মবিকাশের প্রবল আকাঙ্ক্ষা। লোকেরা বুঝল যে শাসনক্ষমতা কিছুটা আয়ত্ত করতে হবে। শ্রমিকরা বুঝল তাদের কাজের জন্য বৈজ্ঞানিক কুশলতা বাড়াতে হবে। তার জন্য তাদের লেখাপড়া শেখা চাই।

দেশের শিক্ষা বিভাগে নতুন শাখা খোলা হলো। বিদ্যালয়ের বহির্ভূত শিক্ষার ভার পড়ল এই শাখার উপর। এর প্রধান কাজ হলো নিরক্ষরতা দূরীকরণ প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা, তৎসংক্রান্ত নানা সমস্যার সমাধান করা, প্রচার কার্য পরিচালনা করা, পাঠসূচি প্রণয়ন করা, পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করা, শিক্ষাপ্রণালী নির্ধারণ করা। স্থানীয় সংস্থার সাহায্যে এই শাখা সাক্ষরতার অভিযান পরিচালনা করতে লাগল। উনিশশ' বিশ সালে অল রাশিয়া এক্‌স্ট্রা অর্ডিনারী কমিশন ফর দি ইরাডিকেশান অব ইললিটারেসী নামে প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠল। এই সংস্থা দীর্ঘকাল নিরক্ষরতা দূরীকরণের কার্য পরিচালনা করল। এই সংস্থারও অনেক স্থানীয় শাখা গঠন করা হলো।

তার পর প্রায় পনের বছর কেটে গেল। এবার এই কমিশনের কাজ বন্ধ করে দেওয়া হলো। শহরে, গ্রামে, জেলায় নতুন করে নিরক্ষরতা দূরীকরণ কমিটি স্থাপন করা হলো। এইসকল কমিটির অন্যতম কাজ ছিল দেশের শিক্ষাবিভাগ নিরক্ষরতা দূরীকরণের কাজের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ মাল-মশলা সরবরাহ করছে কিনা তা দেখা। বরাদ্দ অর্থ যেন নিরক্ষরতা দূরীকরণের কাজে সঠিকভাবে ব্যয়িত হয় তা দেখাও ছিল এই কমিটির কাজ।

কয়েকটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মোদ্যম ছিল উল্লেখযোগ্য। এর একটির নাম হল ইয়ং কম্যুনিস্ট লীগ। স্থানীয় কমিটিকে এই

প্রতিষ্ঠান নানা ভাবে সাহায্য করল। প্রচার-কার্য, প্রকৃত শিক্ষাদান কাজ এবং পুস্তক সরবরাহের কাজে এই প্রতিষ্ঠানের দৃষ্টান্ত প্রশংসনীয়। এই প্রতিষ্ঠানের সভ্যদের কাউকে নিরক্ষর থাকতে এরা দিল না। এরা ধ্বনি তুলল—প্রত্যেক সাক্ষর ব্যক্তিকে অন্তত একজন নিরক্ষরকে সাক্ষর করতে হবে। নিরক্ষরতা দূরীকরণের শিক্ষকতা করার জন্য যে বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজন, এর কর্মীরা সে শিক্ষা গ্রহণ করল। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লোকেদের এরা ভর্তি করাল। প্রচারকার্য চলতে লাগল। দেশের গ্রন্থাগার, সমবায় সমিতি প্রভৃতিও নিরক্ষরতা দূরীকরণ অভিযানে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করল। রাশিয়ার শ্রমিক সংঘের কেন্দ্রীয় সংস্থাও একাজে অভূতপূর্ব উৎসাহ প্রদর্শন করল। এই সংস্থা শ্রমিকদের এবং তাদের পরিবারের লোকেদের নিরক্ষরতা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে শিক্ষা গৃহের ব্যবস্থা করে দিল, গৃহে আলো এবং উত্তাপের ব্যবস্থা করল, শিক্ষার্থীদের ভর্তি করিয়ে দিতে লাগল, তাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যোগদানে উৎসাহ দিতে লাগল। এই সংস্থা শিক্ষার্থীদের শিক্ষাকেন্দ্রে হাজির করাবার দায়িত্ব গ্রহণ করল। মালিকরা শ্রমিকদের শিক্ষালাভের প্রয়োজনীয় সুবিধা যেন দেয় তাও এই সংস্থা দেখতে লাগল। এরা ছাত্র-ছাত্রীদের বহু পুস্তক এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র দিয়ে সাহায্য করতে লাগল।

উনিশশ' তেইশে একটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হলো, এর নাম ডাউন উইথ ইল্লিটারেসী সোসাইটি—নিরক্ষরতা নিপাত যাক্ সংস্থা। আঠার বছর বয়সের ঊর্ধ্বে সব নাগরিকই এর সভ্য হতে পারত। চৌদ্দ থেকে সতের বছর বয়সের যে সব ছেলেমেয়ে কারখানায় বা আপীসে কাজ করত তারা এর সভ্য হতে পারত। উনিশ শ চব্বিশে এর সদস্য সংখ্যা ছিল ষোল লাখ। এই সংস্থার প্রধান কাজ ছিল নিরক্ষরতা দূরীকরণ অভিযানকে সফল করে তোলা। গ্রামে গ্রামে কলকারখানায় এই সংস্থার শাখা স্থাপিত হলো। "নিরক্ষরতা নিপাত যাক" সংস্থার উল্লেখযোগ্য কাজ হলো নিরক্ষরতা

দূরীকরণের জন্য পুস্তক প্রণয়ন করা। উনিশ শ' চব্বিশ সালে এই সংস্থার সভাপতি হল মিখাইল ইভানোভিচ কালিনিন—যিনি ছিলেন তৎকালীন সোভিয়েট রাশিয়ার কেন্দ্রীয় কার্যকরী সমিতির সভাপতি—অর্থাৎ রাশিয়া প্রজাতন্ত্রের সভাপতি। এধরণের একজন ব্যক্তি সংস্থার সভাপতি নির্বাচিত হওয়ায় বুঝা যায় তখনকার রাশিয়াবাসীরা নিরক্ষরতা দূরীকরণকে কত বড় স্থান দিয়েছিল। কালিনিন নিজে বহুবিধ কাজে ব্যস্ত থাকলেও নিরক্ষরতা দূরীকরণের কার্য পরিচালনায় সক্রিয় অংশ গ্রহণ করলেন। যে বহু সহস্র স্বেচ্ছাসেবক বিনা পারিশ্রমিকে নিরক্ষরতা দূরীকরণের মত সমাজ সেবার কাজে আত্ম নিয়োগ করল, কালিনিন তাদের কার্যে নির্দেশ দিতেন। এই স্বেচ্ছাসেবকদের নাম ছিল কৃষ্টি সৈনিক—Soldiers of Culture.

গোটা রাশিয়ায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান অন্য কাজ স্থগিত রেখে লোকদের সাক্ষর করে তোলার কাজে লেগে গেল। সংবাদপত্রগুলো ব্যাপক প্রচার কার্য চালাল। একদিকে বিশিষ্ট রাজনৈতিকগণ, লেখকগণ, বৈজ্ঞানিকগণ, শিক্ষাবিদগণ, অপরদিকে লেখাপড়া জানা শ্রমিকরা, বিত্থালয়ের ছাত্রছাত্রীরা নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে যে জেহাদ শুরু হয়েছিল তাতে অংশ গ্রহণ করল। কয়েকটি বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠান তাদের নির্দিষ্ট সংখ্যক কর্মচারীকে নিরক্ষরদের পড়াবার কাজে লাগাল। তারা প্রয়োজনীয় অর্থ সরবরাহ করতে লাগল। সংবাদপত্রগুলোতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মোত্থমের সাফল্যের খতিয়ান প্রকাশিত হল। সাময়িক পত্রপত্রিকার প্রকাশ সংখ্যা খুব বেড়ে গেল। কোন প্রতিষ্ঠান বা তার শাখা বা কোন বিত্থালয় নিরক্ষরতা দূরীকরণের কাজে সর্বাপেক্ষা বেশী উল্লেখযোগ্য কাজ করল তা নির্ণয়ের জন্য প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হলো।

কয়েক বছরের মধ্যে লক্ষ লক্ষ বর্ণমালার পুস্তিকা, নানা ধরণের উপযোগী পুস্তক এবং কার্ডবোর্ডের বর্ণমালা এবং অন্য ধরণের বিশেষোপকরণ তৈরী এবং বণ্টন করা হল। বই তৈরী হল পঁচিশটি ভাষায়, লক্ষ লক্ষ লোক লিখতে পড়তে শিখল। সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য

পরিসংখ্যান থেকে দেখা গেল উনিশ শ' আটাশ উনত্রিশে লিখতে পড়তে শিখল বিশ লক্ষ লোক। উনিশ শ' উনত্রিশ ত্রিশে লিখতে পড়তে শিখল আশি লক্ষ লোক আর উনিশ শ' ত্রিশ একত্রিশে শিখল এক কোটি দশ লক্ষ লোক। কয়েক বছরের মধ্যে চার কোটির বেশী সংখ্যক লোক এই নিরক্ষরতা দূরীকরণ অভিযানের মধ্য দিয়ে লিখতে পড়তে শিখল। একমাত্র নিরক্ষরতা নিপাত যাক সংস্থার প্রচেষ্টায়ই লিখতে পড়তে শিখল এক কোটি চল্লিশ লক্ষ লোক।

মেয়েদের শিক্ষার কাজে তাদের পারিবারিক দায়িত্ব যেন কোন বাধাসৃষ্টি করতে না পারে, তার জন্য তাদের শিক্ষাকেন্দ্রের সঙ্গে তাদের শিশুদের জন্য নার্সারী, কিণ্ডারগার্টেন এবং ক্রীড়াকেন্দ্র স্থাপন করা হলো। ফলে মায়েরা নিজেদের শিশুদের সঙ্গে নিয়েও শিক্ষাকেন্দ্রে যোগদান করতে পারত।

লিখতে পড়তে শিখে যদি আর চর্চা না করে তাহলে অর্জিত বিদ্যা বা কুশলতা নষ্ট হয়ে যাবে। তাই এই অর্ধ শিক্ষিত বা নব্যশিক্ষিতরা যাতে চর্চার বা অধিকতর শিক্ষার সুযোগ পায় তার ব্যাপক ব্যবস্থা করা হলো। তাদের জন্য নতুন বিদ্যালয় স্থাপন করা হলো। এরা যেন সংবাদপত্র, তাদের উপযোগী এবং প্রয়োজনীয় বই পড়তে পারে তার ব্যবস্থা করা হলো। নতুন নতুন পাঠাগার স্থাপন করা হল। এদের লেখা প্রবন্ধাদি সংবাদপত্রে ছাপান হতে লাগল।

নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে ব্যাপক অভিযান রাশিয়ায় সফল হলো। কয়েক বৎসরের মধ্যেই দেশ থেকে নিরক্ষরতা লোপ পেল। একুশ কোটি লোক দ্বারা অধ্যুসিত এ অঞ্চলে আজ শতকরা চুরানব্বই জন লিখতে পড়তে জানে।

কি করে এমন কাজ সফল হলো? নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য আইন করা হয়েছিল। তবুও আইনের সাহায্য তেমন নিতে হয় নি। দেশের সমগ্র জনসাধারণ সচেতন হয়ে উঠেছিল। অভূতপূর্ব আগ্রহে তারা নিরক্ষরতা দূরীকরণে ব্রতী হয়েছিল। দেশে নানা সমাজকল্যাণ-

সাধক সংস্থা পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা করে অথচ প্রতিযোগিতার ভাব বজায় রেখে অনন্যমনা হয়ে কাজে লেগে ছিল। পরিকল্পনা থাকল এক, কাজ করল নানা সংস্থা। দেশের নেতারা লোকেদের উদ্বুদ্ধ করে তুলেছিল। স্বেচ্ছাসেবকরা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিল। তাই এই অভিযান ব্যাপকভাবে সফল হলো।

(এগার)

পূর্ণ সাক্ষরতার পথে রুমানিয়া কি করে এগিয়েছিল

অতি অল্পসময়ের মধ্যে রুমানিয়ার পিপল্স রিপাবলিক্ কেমন করে দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূর কবল তা বেশ অনুধাবনযোগ্য উনিশশ' ত্রিশ সালের আদমশুমারে দেখা গেল রুমানিয়ার শতকরা প্রায় চল্লিশজন লোক নিরক্ষর ছিল। এর মূলে ছিল দেশের সরকারের ঔদাসীন্য। প্রয়োজনের তুলনায় খুব কম অর্থই ব্যয় করা হত শিক্ষার জন্য। অনেক গ্রাম ছিল যেখানে কোন প্রাথমিক বিদ্যালয়ও ছিল না। যে সব বিদ্যালয় ছিল তার অর্ধেক গুলোতেই মোট একটা করে শ্রেণী ছিল। প্রয়োজনানুরূপ শিক্ষকও ছিল না। গ্রামে শিশুর পিতারা ছিল বেশীরভাগই ভূমিহীন চাষী। শিক্ষার ব্যয় বহন করার ক্ষমতা এদের ছিল না। শহরের শ্রমিকদের অবস্থা ছিল অনুরূপ। যে ক'জন ধনিকের হাতে শহরের অর্থের বিশেষ অংশ গিয়ে পড়ত তারা শ্রমিকদের শিক্ষার প্রতি ছিল পূর্ণ উদাসীন। এ সত্ত্বেও শতকরা সত্তর জন বালক বালিকা বিদ্যালয়ে ভর্তি হত, কিন্তু এদের অর্ধেক বিদ্যালয়ে রীতিমত হাজির হত না। যারা রীতিমত হাজির হত তাদের কিছু-সংখ্যক আবার বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ না করেই বিদায় নিত। যারা শেষ করত তারাও পরবর্তীকালে চর্চার সুযোগ পেত না বলে সব কিছু ভুলে যেত। সাধারণ লোকেদের জীবনযাত্রা প্রণালীর সঙ্গে শিক্ষার ধারার কোন যোগ ছিল না বলে অভিভাবকরাও শিক্ষার প্রতি কিছুটা উদাসীন ছিল। আঠারশ' চৌষট্টি সালে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হলো। আইনত বাধ্যতামুলক হলো বটে, কিন্তু আইন প্রয়োগ করা সম্ভব হলো না। দেখা গেল আইন অমান্যকারীর সংখ্যা আইন মান্যকারীদের সংখ্যার চাইতে অনেক বেশী। উনিশ-শ' পঁয়তাল্লিশ সালের এক হিসাবে দেখা গেল রুমানিয়াতে নিরক্ষর ব্যক্তির সংখ্যা

হল শত করা চল্লিশ জনের অধিক। সে বছর থেকে নিরক্ষরতা দূর করার একটা প্রবল চেষ্টা চলল। শ্রমিক সঙ্ঘ শুরু করলে এ চেষ্টা। তিন বছরের চেষ্টার পর দেখা গেল নিরক্ষরদের সংখ্যা কমে দাঁড়াল বত্রিশ লক্ষতে। এদের মধ্যে প্রায় আঠাশ লক্ষই ছিল গ্রামের অধিবাসী। আর একটি জিনিষ লক্ষ্য করা গেল। সে হচ্ছে পুরুষের দ্বিগুণ সংখ্যক মেয়েরা নিরক্ষর, কয়েকটি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষিতের হার খুব কম।

উনিশ শ' আটচল্লিশ সালে শিক্ষাসংস্কার করার জন্য আইন সভায় একটি বিল পাশ হল। এই আইনের বিধানে নিরক্ষরতা দূরীকরণের ব্যবস্থা হল। প্রত্যেক বার্ষিক বা পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এর জন্য অর্থবরাদ্দ হল। নিরক্ষরতা দূরীকরণের কার্য সংগঠন এবং পরিচালনের ক্ষমতা থাকল শিক্ষামন্ত্রকের হাতে। এই আইনের একটি বিধানে ছিল চৌদ্দ বছর থেকে পঞ্চান্ন বছর বয়সের সকল নরনারীকেই লেখা-পড়া শিখতে হবে। তার চাইতে বেশী বয়সেরও কোন শ্রমিক বা অন্য কেউ যদি লেখাপড়া করতে চাইত তবে তাদেরও অধিকার স্বাকৃত হত।

কাজ শুরু হওয়ার পর প্রথম আট বছরের প্রত্যেক বছরই নিরক্ষর লোকদের একটা আদমশুমার তৈরী করা হত। সকল লোককে চৌদ্দ থেকে কুড়ি, একুশ থেকে চল্লিশ, একচল্লিশ থেকে পঞ্চাশ, একান্ন থেকে ষাট, এবং ষাটের ঊর্ধ্বে এই পাঁচটি ভাগে ভাগ করা হত। নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য যে পরিকল্পনা রচিত হত তার ভিত্তি হত এই পরিসংখ্যান। বয়স্ক ছাত্র ছাত্রীদের জন্য তু'বছর শিক্ষার ব্যবস্থা হলো। শিশুরা যা তুবছরে শেষ করবে বয়স্কদের ক্ষেত্রে তা একবছরে শেষ করার ব্যবস্থা হলো। ফলে তুবছরে বয়স্করা শিশুদের চার বছরের পাঠ্য শেষ করত। তার পরে হলো তাদের একটা পরীক্ষা গ্রহণ করার ব্যবস্থা।

নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য কারখানায়, কর্মক্ষেত্রে, বিদ্যালয়ে,

কৃষিক্ষেত্রে, সমবায় কেন্দ্রে শিক্ষার ব্যবস্থা হলো। এমনকি নিরক্ষর ব্যক্তিকে কোন ক্ষেত্রে নিজ বাড়িতেও পড়াবার ব্যবস্থা হলো। কোন কোন ক্ষেত্রে গ্রামে এক সঙ্গে এমন কি তিনজনকে পড়ান হতে লাগল। শহরে দশ থেকে কুড়ি জনকে একসঙ্গে পড়ানর ব্যবস্থা হলো। নানা অঞ্চলের শিক্ষিত ব্যক্তিরা শিক্ষাদানের ভার নিল। বিভিন্ন অঞ্চলের বা শহরের গণসভা (People's Council) নিরক্ষরতা দূরীকরণের কাজে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করল। বিভিন্ন সমাজকল্যাণ সংস্থাও পিছিয়ে থাকল না। সবাই মিলে একযোগে নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি করল।

প্রথমদিকে দেখা গেল বয়স্ক ব্যক্তিদের নিয়মিত শিক্ষাকেন্দ্রে আনাই কঠিন কাজ হয়ে দাঁড়াল। বয়স্করা সাক্ষরতার গরজই কিছু বুঝল না। গরজটা এদের ভাল করে বুঝিয়ে দেবার জন্য বেশ বড়-রকমের একটা উদ্যমের দরকার হলো। প্রাদেশিক সংবাদপত্রগুলো প্রবন্ধ ছাপাতে লাগল, সাক্ষরতা সংক্রান্ত পরীক্ষানিরীক্ষার ফলাফল ছাপাতে লাগল। নতুন যারা লিখতে পড়তে শিখল তাদের দিয়ে বেতার বক্তৃতার ব্যবস্থা হলো। বেতারে নানা ধরণের বক্তৃতা প্রচার করা হলো, যাতে নিরক্ষর ব্যক্তিরা সাক্ষরতা লাভে আকৃষ্ট হয়। বেতারে লোকেদের কাছে নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য আবেদন জানান হলো। যারা নিরক্ষরতা দূরীকরণের কাজে বেশ তৎপরতা এবং সাফল্য দেখিয়েছে, তাদের নাম বেতারে ঘোষণা করা হলো। চলচ্চিত্রে নিরক্ষরতা দূর করার অভিযান এবং উপায় প্রভৃতি দেখান হলো।

রুমানিয়ার লেখকসঙ্ঘ এই অভিযানকে বিষয়বস্তু করে কয়েকখানা ছোট ছোট নাটক লিখল। এই নাটকগুলো নানা ধরণের প্রকাশ্য স্থানে অভিনীত হলো। লেখকরা এই সম্বন্ধে সহজ ভাষায় অনেক বই লিখল। তাতে প্রচার কার্যও যেমন হলো, অর্ধশিক্ষিতদের অধিকতর শিক্ষার কাজে তেমন সহায়তাও হলো। নানা ধরণের মনোরম প্রাচীরপত্র ছাপা হলো। লোকেরা জিগির তুলল—নিরক্ষরতা দূর কর।

দেশলাইয়ের বাক্সের উপর লেখা দেখা গেল—"নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে লড়াই কর।" একমাত্র উনিশ শ' তেপ্পান্নতেই শ্রমিকসঙ্ঘ বাহান্ন হাজার রঙীন প্রাচীর পত্র বের করল, ষাট হাজার আবেদন ছাপাল, কোন কেন্দ্রে বা কারখানায় কতটা কাজ হলো তার একটা চিত্র কেন্দ্রের বা কারখানার বাইরে ঝুলিয়ে দেওয়া হলো। সার্থক কর্মীদের নাম প্রাচীরপত্রে লিখে দেওয়া হলো।

শিক্ষকরা প্রচারকার্যে সহায়তা করল। অনেকে কারখানায় গিয়ে শ্রমিকদের বুঝাতে লেগে গেল। শ্রমিকদের কাজের সময় এমনভাবে ঠিক করে দেওয়া হলো যেন লেখাপড়া করতে তাদের কোন অসুবিধা না হয়। যারা লেখাপড়া করছে তাদের যেন কর্মোপলক্ষে বাইরে যেতে না হয়, তার ব্যবস্থা হলো। যারা লেখাপড়া করতে যেত না তাদের সঙ্গে কর্মীরা নিয়ত দেখা সাক্ষাৎ করতে লাগল। নানা আলাপ আলোচনার মাধ্যমে তারা তাদের কাছে লেখাপড়ার গরজ বুঝিয়ে দিতে লাগল।

যে সকল নিরক্ষর ব্যক্তি সাক্ষরতা লাভে কৃতিত্ব দেখাল, তাদের পুরস্কারের ব্যবস্থা হলো, তাদের জন্য পূর্ণ বেতনে ছুটির ব্যবস্থা হলো। বিনাব্যয়ে তাদের বাইরে বেড়িয়ে আসার সুযোগ দেওয়া হলো। বেতারে ও সভা সমিতিতে তাদের নাম সম্মান সহকারে উল্লেখ করা হলো। সমাজ তাদের অধিকতর খাতির দেখাতে লাগল। কারখানার লেখাপড়া জানা কর্মীদের বেতনের হার একটু বাড়িয়ে দেওয়া হলো। এদের অধিকতর লেখাপড়া করার সুযোগ দেওয়া হলো।

বছরে বছরে নতুন করে পরিসংখ্যান তৈরী করার ফলে কাজের অগ্রগতি সহজে নির্ণীত হলো, আর ভবিষ্যতে করণীয় কাজের পরিমাণ সম্বন্ধেও সম্যক ধারণা করার সুবিধা হলো। এসব যখন সকলের অবগতিতে আনা হলো বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তাদের ভবিষ্যৎ কর্মসূচী প্রণয়ন করল। প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের কর্মীদের সচেতন করে দিতে পারল।

বয়স্কদের আক্ষরিক শিক্ষাদান পদ্ধতি যেন ক্রমে উন্নত হয় সে

দিকে নজর দেওয়া হলো। কতকগুলো নির্দেশ সম্বলিত কার্যসূচী বহুল পরিমাণে প্রচার করা হলো। শিক্ষকদের জন্য বহু শিক্ষণ-সহায়িকা ছাপিয়ে তাদের মধ্যে বণ্টন করা হলো। বিশেষজ্ঞরা পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর শিক্ষাদান পদ্ধতিকে দিন দিনই মার্জিত এবং পরিবর্ধিত করতে লাগল। শিক্ষাদান কার্যে প্রয়োজনীয় উপাদানাদি প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হতে লাগল।

শিক্ষক, অধ্যাপক এবং শিক্ষাবিদ্‌গণ বয়স্কদের আক্ষরিক শিক্ষাদানকে একটা নৈতিক কর্তব্য মনে করল। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সহস্র সহস্র স্বেচ্ছাসেবককে বয়স্কদের পাঠদান করার উপযোগী করার উদ্দেশ্যে বিশেষ ধরণের শিক্ষাদান করল। তাতে এরাও বিনা পারিশ্রমিকে শিক্ষাদান কার্যে সাহায্য করতে পারল। শিক্ষাদান কার্যে যারা পারদর্শিতা দেখাতে পারল, তাদের পুরস্কৃত বা অন্যভাবে সম্মানিত করা হলো। কৃতী ছাত্রছাত্রীরাও সম্মান বা পুরস্কার থেকে বঞ্চিত হলো না। আইনসভার প্রকাশ্য অধিবেশনে নিরক্ষরতা দূরীকরণের কাজে কৃতীকর্মীর নাম উল্লেখ করা হলো। বিশিষ্ট শিক্ষক বলে তাদের সম্মান দেওয়া হলো।

নিরক্ষরতা দূরীকরণের কাজে সরকারের শিক্ষা দপ্তরের সঙ্গে বিভিন্ন বেসরকারী প্রতিষ্ঠান এবং জনসাধারণ সহযোগিতা করল। বাস্তবিক বিপুল আকারে জনসাধারণ যদি তাদের সক্রিয় সমর্থন দিয়ে প্রচেষ্টাকে পুষ্ট না করত, তবে সাফল্য অনিশ্চিত ছিল। উনিশ শ' আটচল্লিশ উনপঞ্চাশে মোট চার লক্ষ শিক্ষার্থীর শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। অথচ দেখা গেল, প্রকৃতপক্ষে ছয় লক্ষ সত্তর হাজার নিরক্ষর ব্যক্তি অক্ষরজ্ঞান লাভের জন্য বিভিন্ন কেন্দ্রে নিয়মিতভাবে হাজির হতে লাগল। এমন ধারা সাধারণতঃ হয় না। তার পরবর্তী বর্ষে মোট ছয় লক্ষ সতের হাজার ব্যক্তি দু-বছর শিক্ষালাভ শেষ করে সাক্ষরতা অর্জন করল। এমন একটা কাজ কোন দেশের সরকারই নিজ চেষ্টায় সম্পাদন করতে পারত না, যদি না তার পশ্চাতে জনসাধারণের উৎসাহ

উদ্দীপনা না থাকত। দশ বছরে দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূর হয়ে গেল।

লেখাপড়া শিখার পর লোকেদের অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনে কেমন ধারার পরিবর্তন এল, তাও লক্ষ্য করার বিষয়। যারা লেখাপড়া শিখল, তারা লেখাপড়ার সাহায্যে নতুন নতুন কারিগরী কুশলতা অর্জন করে কলকারখানায় উচ্চতর পদে নিযুক্ত হতে লাগল। ফলে এদের আয় বাড়তে লাগল। লেখাপড়া শিখার ফলে তাদের জীবনের মান উন্নীত হলো। তারা নানা কৃষ্টিমূলক অনুষ্ঠানে সক্রিয়-ভাবে যোগদানের সুযোগ পেল। সমাজে তাদের সম্মান বেড়ে গেল। যারা অধিকতর লেখাপড়া করার আগ্রহ প্রকাশ করল, তাদের জন্য উন্নতধরণের সান্ধ্য বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা হলো। আর যারা অপরের সঙ্গে সাধারণ শিক্ষায়তনে শিক্ষালাভ করতে চাইল, তারা সে সুযোগ সহজেই পেল। যে সকল কারিগরী বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে হলে কিছুটা লেখাপড়া জানার প্রয়োজন—সে সকল কারিগরী বিদ্যালয়ে এরা ভর্তির সুযোগ পেল। নব্যশিক্ষিতেরা সত্যিই জীবনে নতুন আলোর নিশ্চিত সন্ধান পেল।

জনগণের সাক্ষরতাপ্রাপ্তিকে স্থায়ী করতে হলে দু'টো ব্যবস্থা করতে হয়। একদিকে শিশু-শিক্ষার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা চাই, অপরদিকে চাই যারা লেখা পড়া শিখল, তারা যেন পুনরায় নিরক্ষরতায় নিমগ্ন না হয় তার ব্যবস্থা করা। শিশু-শিক্ষার জন্য এমন ব্যবস্থা হলো, যার ফলে শতকরা নব্বইজন বালক বালিকা শিক্ষার সুযোগ নিতে পারল। নার্সারি শিক্ষাকেও ব্যবস্থা থেকে বাদ দেওয়া হলো না। আবার নব্যশিক্ষিতেরা যাতে লেখাপড়ার চর্চা করতে পারে তার জন্য অনেক পাঠাগার স্থাপন করা হলো। উনিশ শ' ছিচল্লিশে যে পাঠাগারের সংখ্যা ছিল ত্রিশ হাজার, উনিশ শ' উনপঞ্চাশে তার সংখ্যা হলো উনচল্লিশ হাজার। মুদ্রিত পুস্তকের সংখ্যাও অনুরূপ বেড়ে গেল।

রুমানিয়ার এই সকল উদ্যম শিক্ষায় অনুন্নত দেশগুলোর কাছে

দৃষ্টান্ত হয়ে রইল। এই উদ্যমকে সম্যকভাবে অনুধাবন করলে বোঝা যায় নিরক্ষরতা দূরীকরণ একটা কঠিন কাজ নয়—যদি সরকার, বিভিন্ন বেসরকারী প্রতিষ্ঠান এবং জনসাধারণ একযোগে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে কর্মসম্পাদনে ব্রতী হয়।

সাক্ষরতায় পশ্চিমবঙ্গের স্থান কোথায়

বিগত উনিশ শ' একষট্টি সালের লোক গণনার সংক্ষিপ্ত বিবরণী থেকে নিচের এই পরিসংখ্যানটি পাওয়া যায়ঃ

স্থান ১৯৬১	রাজ্য	অঞ্চল	শতকরা সাক্ষরতার হার ১৯৬১	শতকরা সাক্ষরতার হার ১৯৫১	স্থান ১৯৫১
১		দিল্লী	৫২·৭	৩৮·৪	২
২	কেরালা		৪৬·৮	৪০·৬	১
৩		পণ্ডিচেরী	৩৭·৪	—	—
৪		আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ	৩৩·৬	২৫·৮	৩
৫	মাদ্রাজ		৩১·৪	২০·৮	৭
৬	গুজরাট		৩০·৫	২৩·১	৫
৭		মণিপুর	৩০·৪	১১·৪	১৬
৮	মহারাষ্ট্র		২৯·৮	২০·৯	৬
৯	পশ্চিমবঙ্গ		২৯·৪	২৪·৬	৪
১০	আসাম		২৭·৪	১৮·৩	৯
১১	মহীশূর		২৫·৪	১৯·৩	৮
১২	পঞ্জাব		২৪·২	১৫·২	১২
১৩		লাক্ষাদ্বীপ, মণিকয় দ্বীপপুঞ্জ ও আমিন দ্বীপপুঞ্জ	২৩·৩	১৫·২	১৩
১৪	উড়িষ্যা		২১·৭	১৫·৮	১০
১৫	অন্ধ্রপ্রদেশ		২১·২	১৩·১	১৪
১৬	ত্রিপুরা		২০·২	১৫·৫	১১
১৭	বিহার		১৮·৪	১২·২	১৫

স্থান ১৯৬১	রাজ্য অঞ্চল	শতকরা সাক্ষরতার হার ১৯৬১	১৯৫১	স্থান ১৯৫১
১৮	নাগাল্যাণ্ড	১৭.৯	১০.৪	১৮
১৯	উত্তর প্রদেশ	১৭.৬	১০.৮	১৭
২০	হিমাচল প্রদেশ	১৭.১	৭.৭	২১
২১	মধ্যপ্রদেশ	১৭.১	৯.৮	১৯
২২	রাজস্থান	১৫.২	৮.৯	২০
২৩	সিকিম	১২.৩	৭.৩	২২
২৪	জম্মুকাশ্মীর	১১.০	—	—
২৫	দাদরা নগর হাভেলী	৯.৫	—	—
২৬	নেফা	৭.২	—	—

এই পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় উনিশশ' একান্ন সালে পশ্চিম বঙ্গে সাক্ষরতার শতকরা হার ছিল কিঞ্চিদধিক চব্বিশ। উনিশশ' একষট্টি সালে তা বেড়ে হলো কিঞ্চিদধিক উনত্রিশ। আবার রাজ্য এবং অঞ্চলগুলোর মধ্যে উনিশশ' একান্ন সালে সাক্ষরতায় পশ্চিমবঙ্গের স্থান ছিল চতুর্থ, আর পরবর্তীবারে পশ্চিমবঙ্গের স্থান হলো নবম। এ থেকে দুটো সিদ্ধান্ত হতে পারে। প্রথম হলো দিল্লী, মণিপুর প্রভৃতি অঞ্চল বা মাদ্রাজ, মহারাষ্ট্র, গুজরাট, কেরালা প্রভৃতি রাজ্যের তুলনায় সাক্ষরতায় পশ্চিমবঙ্গের অগ্রগতি উল্লেখযোগ্য নয়। দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত বা অনুসিদ্ধান্ত হলো সাক্ষরতায় পশ্চিমবঙ্গের স্থান অনেকখানি নেমে গেছে। যে স্থলে দশবছর আগে পশ্চিমবঙ্গ চতুর্থ স্থানের গৌরবের অধিকারী ছিল, সে স্থলে দশ বছর পরে তাকে ভোগ করতে হচ্ছে নবম স্থানে অবনমনের গ্লানি। কয়েকটি রাজ্যই দু' একস্থান করে নিচুতে নেমে এসেছে, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ নেমে এসেছে পাঁচ স্থান নিচুতে।

যে সিদ্ধান্ত দু'টোর উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলোকে পুরোপুরি নিষ্পন্ন সিদ্ধান্ত ব'লে মেনে নেওয়ার আগে যেই পরিসংখ্যান এই সিদ্ধান্তের পোষকতা করে ব'লে মনে করা হয়, সেই পরিসংখ্যানের

অন্তর্ভুক্তি এবং সংশ্লিষ্ট সকল তথ্য যথাযথ বিবেচিত হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করে দেখা প্রয়োজন।

প্রথমেই লক্ষ্য করা যায় যে, উনিশশ' একান্ন সালের ভারতের আদমশুমারে পন্দিচেরীর হিসাব ছিল না, থাকার কথাও নয়। যেহেতু এবারকার আদমশুমারের আগে পন্দিচেরী ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, সেহেতু পন্দিচেরীকে এবারকার আদমশুমারের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এবারের হিসাবে দেখা যায় যে ক'টি রাজ্য বা অঞ্চলের স্থান পশ্চিমবঙ্গের উপরে, সে ক'টি রাজ্য বা অঞ্চলের অন্যতম হলো পন্দিচেরী। উনিশশ' একান্ন সালের আদমশুমারেও যদি পন্দিচেরীর হিসাব দেওয়া হত তাহ'লে তখনও যে তার স্থান পশ্চিমবঙ্গের উপরে হত না তা নিঃসংশয়ে বলার কোন উপায় নেই। তাহলে সেবার পশ্চিম বঙ্গের স্থান চতুর্থ না হয়ে হত পঞ্চম। অথবা আগের বারের মতই যদি পন্দিচেরী হিসাবের আমলে না আসত, তবে পশ্চিমবঙ্গ এবার একস্থান উপরে উঠে আসত।

আবার দেখা যায় যেকটি রাজ্য এবার পশ্চিমবঙ্গের উপরে স্থান পেয়েছে তার মধ্যে রয়েছে গুজরাট আর মহারাষ্ট্র। আগের বারের আদমশুমারে এদুটি রাজ্য ছিল একসঙ্গে 'বোম্বাই'। আর বোম্বাইএর স্থান ছিল পশ্চিমবঙ্গের নিচে। বোম্বাই যদি দ্বিখণ্ডিত না হত, এবং সে অবস্থায় পশ্চিমবঙ্গের উপরে উঠে আসত তা'হলে পশ্চিমবঙ্গ নেমে যেত একস্থান। অথচ দ্বিখণ্ডিত বোম্বাই অর্থাৎ গুজরাট আর মহারাষ্ট্র উপরে উঠে আসায় পশ্চিমবঙ্গ নেমে গেল দুইস্থান। এথেকে বুঝা যায় পশ্চিমবঙ্গেরস্থান সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত একেবারে সুনিশ্চিত সিদ্ধান্ত নয়, আর এই অনিশ্চয়তার মূলে রয়েছে দুবারকার হিসাবের আংশিক তারতম্য।

এ প্রসঙ্গে এটাও লক্ষ্য করা যায় যে পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাজ, গুজরাট, মনিপুর ও মহারাষ্ট্রের পশ্চাতে বটে, কিন্তু এসকল রাজ্যের সঙ্গে তফাৎ বড় একটা বেশী কিছু নয়।

এবার অপর সিদ্ধান্তের আলোচনায় আসা যাক। যে স্থলে

সাক্ষরতার শতকরা হার মণিপুরে বাড়ল উনিশ, দিল্লীতে বাড়ল চৌদ্দ, মাদ্রাজে বাড়ল এগার, মহারাষ্ট্রে বাড়ল নয়, সে স্থলে পশ্চিমবঙ্গে বাড়ল পাঁচ। পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে এটা একটা গ্লানির ব্যাপার। মনে হয় আত্মপক্ষ সমর্থনে পশ্চিমবঙ্গের বক্তব্য কিছু নেই।

বক্তব্য যে একেবারে নেই তা নয়। নিচের এই পরিসংখ্যান দুইটি একবার দেখা যাক ঃ

পশ্চিমবঙ্গ

(খ) বৎসর	মোট লোকসংখ্যা	সাক্ষরব্যক্তির সংখ্যা	সাক্ষরতার হার
১৯৫১	২,৬৩,০২,৩৮৬	৬৫,৭৫,৫৯৬	২৪·৬
১৯৬২	৩,৪৯,৬৭,৬৩৪	১,০১,৮০,৬৮৫	২৯·৪

(গ) রাজ্য	মোট লোকসংখ্যা	১৯৫১—৬১ বৃদ্ধির হার
পশ্চিমবঙ্গ	৩,৪৯,৬৭,৬৩৪	৩২·৯
গুজরাট	২,০৬,৩৩,৩৫০	২৬·৮৮
কেরালা	১,৬৯,০৩,৭১৫	২৪·৭৬
মহারাষ্ট্র	৩,৯৫,৫৩,৭১৮	২৩·৬০
মাদ্রাজ	৩,৩৬,৮৬,৯৫৩	১১·৭৬

এই দুটি পরিসংখ্যান থেকে দেখা যাচ্ছে বিগত দশ বছরে পশ্চিমবঙ্গে মোট ৩৬,০৫,০৮৪ লোককে সাক্ষর করে তোলা সম্ভব হয়েছে। লোকসংখ্যা এ সময়ে বৃদ্ধি পেয়েছে শতকরা ৩২·৯ হারে। উপরের পাঁচটি রাজ্যের মধ্যে লোকসংখ্যা বৃদ্ধির নিকটতম হার হচ্ছে ২৬·৮৮, আর সে হচ্ছে গুজরাটে। পশ্চিমবঙ্গের লোকসংখ্যা যদি ঐ নিকটতম হারেও বৃদ্ধি পেত, তাহলে মোট লোক সংখ্যা হতো ৩,৩৪,০৪,০০০। মোট শিক্ষিতের সংখ্যা আছে ১,০১,৮০,৬৮৫। এতে পশ্চিমবঙ্গের সাক্ষরতার হার হতো ৩০·৫ এবং তাতে পশ্চিমবঙ্গের স্থান মণিপুর আর মহারাষ্ট্রের উপরে উঠে যেত। আর মাদ্রাজের হারে

লোকসংখ্যা বাড়লে পশ্চিমবঙ্গের সাক্ষরতার শতকরা হার হত চৌত্রিশ। পশ্চিমবঙ্গের লোকসংখ্যার অসম্ভব রকমের বৃদ্ধিকে জনসংখ্যার বিস্ফোরণ বলে অভিহিত করা হয়েছে। এই বৃদ্ধি এর সাক্ষরতার হারকে অবনমিত করেছে।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ হতে পারে ছুটো। এক হচ্ছে জন্ম আর হচ্ছে বা'র থেকে লোক আসা। কোন কারণে কি পরিমাণ লোক বেড়েছে, আদমশুমারের আজ পর্যন্ত প্রকাশিত বিবরণ থেকে তা জানা যায় নি। যারা বিগত দশ বছরের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছে তারা দেশের নিরক্ষর ব্যক্তির সংখ্যাই বাড়িয়েছে। আর যারা বহিরাগত তাদের মধ্যে প্রায় সবাই এসেছে নানা শিল্পে নিয়োজিত হতে। এরা প্রতিবেশী রাজ্যের নিরক্ষর সব জনসাধারণ। এই নবজাতকরা এবং বহিরাগতরাই পশ্চিমবঙ্গের সাক্ষরতার হারকে অনেকখানি নামিয়ে রেখেছে।

নিচের এই পরিসংখ্যান থেকে আর একটি তথ্য জানা যাবে।

(ঘ)

জেলা	সাক্ষরতার হার
বাঁকুড়া	২৩·১
বীরভূম	২২·১
বর্ধমান	২৯·৬
হুগলী	৩৪·৭
হাওড়া	৩৬·৯
মেদিনীপুর	২৭·৩
চব্বিশ পরগণা	৩২·৫
নদীয়া	২৭·২
মুর্শিদাবাদ	১৬·০
মালদহ	১৩·৮
জলপাইগুড়ি	১৯·২
পশ্চিম দিনাজপুর	১৭·১

জেলা	সাক্ষরতার হার
দার্জিলিং	২৮·৭
পুরুলিয়া	১৭·৮
কুচবিহার	২১·০
কলিকাতা	৫৯·৩

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য গঠিত হবার পর পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে যেটুকু অঞ্চল নূতন সংযুক্ত হয়েছে, সেটুকুর সাক্ষরতার হার বেশ নিচুতে। যেমন পুরুলিয়ার হার হলো ১৭·৮, কুচবিহারের হার হলো ২১·০০ আর পশ্চিম দিনাজপুরের (এর কিছুটা অংশ পরে যুক্ত হয়েছে) হার হলো ১৭·১। গোটা পশ্চিমবঙ্গের সাক্ষরতার হারের যখন খতিয়ান হলো, তখন এই অপেক্ষাকৃত অনুন্নত অঞ্চলগুলো গড়টাকে (average) কিছুটা নিচুতে নামিয়ে দিল।

উপরের এই আলোচনা থেকে যদি এই ধারণার সৃষ্টি হয় যে এতে আত্মতৃপ্তি বা সান্ত্বনা লাভের একটা ক্ষীণ চেষ্টা হচ্ছে, তাহলে সেই ধারণা নিরসনের জন্য বলা যেতে পারে যে, যে-পশ্চিমবঙ্গ দীর্ঘকাল ধরে শিক্ষার ক্ষেত্রে, বুদ্ধির ক্ষেত্রে, মননের ক্ষেত্রে অগ্রগামীই ছিল, সেই পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে অগ্রগতির এই দৈন্য গ্লানিরই বিষয়। এই গ্লানি মুছে ফেলার জন্য কেবল দেশের সরকার নয়, বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান, নেতা এবং দেশের শিক্ষিত জনসাধারণকে দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করে কাজ করতে হবে। পশ্চিমবঙ্গ থেকে নিরক্ষরতাকে পুরোপুরি ভাবে দূর করতে হবে।

বর্তমান নিরক্ষরতা দূর করার জন্য যে ব্যবস্থা হবে সে ব্যবস্থা হবে, বিশেষ করে বয়স্কদের জন্য। ভবিষ্যতে যেন নিরক্ষরতার সংখ্যা না বাড়তে পারে তার জন্য যে ব্যবস্থা, সে হলো শিশুদের জন্য। আমাদের দেশে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক এবং অবৈতনিক করার ব্যবস্থা হচ্ছে। এ ব্যবস্থা অনুসারে কাজ চললে ভবিষ্যতে নিরক্ষরের সংখ্যা বাড়বার সম্ভাবনা থাকবে কম। এখন কেবল যারা নিরক্ষর বয়স্ক

রয়েছে, তাদের নিরক্ষরতা দূর করতে পারলেই মোটামুটি সামগ্রিক ভাবে নিরক্ষরতা দূরীকরণের ব্যবস্থা হবে।

বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে মোট নিরক্ষর ব্যক্তির সংখ্যা হবে দু'কোটি চল্লিশ লক্ষ। এদের মধ্যে চৌদ্দ বছরের কম বয়সের শিশু এবং চল্লিশোর্ধ বয়সের বয়স্কের সংখ্যা হবে প্রায় দেড় কোটি। বাকী থাকছে নব্বই লক্ষ। এখন এই নব্বই লক্ষ নিরক্ষর নরনারীর নিরক্ষরতা দূর করার একটা ব্যবস্থা করতে পরলেই একটা সুরাহা হয়।

একটা পরিকল্পনা রচনা করে সে অনুসারে কাজ করলে সফলতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া চলে। এটা ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, এই নিরক্ষরতা দূর করতে দশ বছর কাল সময় লাগবে। এই দশ বছরে নব্বই লক্ষ বয়স্ক নিরক্ষরদের মধ্য থেকে প্রায় দশ লক্ষ লোক চল্লিশ বছর বয়সের সীমা উত্তীর্ণ হয়ে যাবে। তাই মোট আশি লক্ষ বয়স্ক নিরক্ষরের শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

একটি বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রে বছরে দুবার করে পাঠদান করলে এবং একটু যত্ন সহকারে পাঠদানের কাজ চালালে অন্ততঃ চল্লিশ জন বয়স্ক নিরক্ষরকে সাক্ষর করে তোলা চলে। তাহলে দশ বছরে প্রতিটি কেন্দ্রে মোট চার শ' নিরক্ষরকে সাক্ষর করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে এটা লক্ষ্য করা উচিত যে একটি কেন্দ্রে কেবল এক জায়গায় দশ বছর কাজ করলে চলবেনা। কারণ যে কোন স্থানের অতি সন্নিকটে চার শ' জন নিরক্ষর বয়স্ক না থাকারই সম্ভাবনা বেশী। তাই প্রয়োজন বোধে কেন্দ্রটিকে স্থানান্তরিত করার ব্যবস্থা রাখতে হবে। মোট আশি লক্ষ লোকের নিরক্ষরতা দূর করতে হলে দশ বছর ধরে কাজ চালাতে হবে বিশ হাজার কেন্দ্রে। মোট সাড়ে আটত্রিশ হাজার গ্রামের জন্য কাজ চলবে এই বিশ হাজার কেন্দ্রে। অর্থাৎ প্রতি দু'গ্রামের জন্য একটি করে কেন্দ্র। প্রতিটি কেন্দ্রকে প্রয়োজনবোধে চালানো যাবে কিছুকাল এক গ্রামে আবার কিছুকাল অপর গ্রামে।

এখন পশ্চিমবঙ্গে রয়েছে মোট বছরে পাঁচ হাজার কেন্দ্র। আরও চাই পনের হাজার নতুন কেন্দ্র। প্রতিটি কেন্দ্রের জন্য বছরে ব্যয় হবে নিম্নরূপ :—

শিক্ষকের বেতন	২৫ × ১২ = ৩০০৲
উপনিসিত্তিক ব্যয় (কেরোসিন বই, শ্লেট, প্রভৃতি)	১৫ × ১২ = ১৮০৲
নিয়ন্ত্রণ পরিদর্শন প্রভৃতি	১০ × ১২ = ১২০৲
	৬০০৲ ছয়শত টাকা,

পনের হাজার অতিরিক্ত কেন্দ্রের জন্য মোট বছরে ব্যয় হবে ৬০০ × ১৫০০০ = ৯০০০০০০ নব্বই লক্ষ। দশ বছরে ব্যয় হবে নয় কোটি টাকা।

একটি পরিকল্পনা আর অর্থের বরাদ্দ এবং আর কর্মচারী নিযুক্ত হলেই একাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হবে না। এর জন্য চাই একটি রাজ্য-জোড়া আন্দোলন। নিরক্ষরতা দূরীকরণ একটা জাতীয় গরজ। এ গরজ মিটানোকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। দেশের নেতাদের অন্ততঃ কয়েক জনকে নিরক্ষরতা দূরীকরণের কাজে আত্মনিয়োগ করতে হবে। বিনোবাজী যেমন 'ভূদানে,' আত্মনিয়োগ করেছেন তেমনি কয়েকজন বিশিষ্ট নেতাকে বিদ্যাদানে আত্মনিয়োগ করতে হবে। তাঁরা একনিষ্ঠভাবে একাজে নিজেদের নিয়োজিত করবেন, লোকেদের অনুপ্রাণিত করবেন, কর্মচারীদের কাজে সহায়তা করবেন, পরামর্শ দিবেন। রাজ্যের প্রতিটি সংবাদপত্রকে নিরক্ষরতা দূরীকরণের অনুকূলে প্রচার কার্য চালাতে হবে, তৎসংক্রান্ত তথ্যাদি প্রকাশ করতে হবে। সেগুলো লোকেদের অবগতিতে আনতে হবে। চলচ্চিত্র, অভিনয় প্রভৃতির মাধ্যমে অনুরূপ প্রচারকার্য চলবে। বিভিন্ন শিল্পের নিয়োগকারীদের তাদের নিরক্ষর শ্রমিকদের লেখাপড়া শিখার সুযোগ দিতে হবে। যারা লেখাপড়া শিখবে তাদের সামান্য হলেও একটু

বর্ধিত হারে পারিশ্রমিক দেবার ব্যবস্থা করতে হবে। তাদের পড়ার মত নতুন নতুন বই রচনা করতে হবে।

কোন কোন দেশে আইনত নিরক্ষরতা দূরীকরণটাকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছিল। কিন্তু তাতে বড় একটা সুফল হয়নি। আইনের সাহায্য প্রকৃতপক্ষে সে সকল দেশ নেয়ও নি। একটা নৈতিক জাগরণ সৃষ্টি করেই সে সকল দেশ তাদের পরিকল্পনা সফল করেছে। আমাদের দেশেও আইনের সাহায্যের কোন প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। আর আইনপ্রণয়ন হলেও যে তা কার্যকরী করা সহজ হবে তেমন মনে করারও কোন কারণ নেই। বরং নিরক্ষর বয়স্কদের শিক্ষালাভের জন্য যত রকমের উৎসাহ দেওয়া যেতে পারে তাই দিতে হবে।

শিক্ষাকেন্দ্রের পরিবেশ মনোরম হতে হবে। শিক্ষকের আচরণ আকর্ষণীয় হওয়া চাই। শিক্ষাব্যবস্থা অবৈতনিক হওয়া চাই। গ্রামে গ্রামে প্রতিযোগিতার ভাব থাকলে ভাল হয়। কেন্দ্রগুলিতে যথাসম্ভব জীবিকার উপায় নির্দেশের একটা ব্যবস্থা থাকলে, যেমন কুটির শিল্প শিক্ষাদানের ব্যবস্থা থাকলে, নিরক্ষর বয়স্করা তাতে আকৃষ্ট হবে। সদ্য সাক্ষরদের পুরস্কৃত করলে, সমাজে তাদের মর্যাদা বাড়লে নিরক্ষর ব্যক্তি সাক্ষরতা লাভে উৎসাহিত হয়।

নিরক্ষরতা দূরীকরণের কাজ প্রধানতঃ শিক্ষা বিভাগের দায়িত্ব। কিন্তু এ দায়িত্ব পালন করতে হলে এই বিভাগকে সরকারের অন্যান্য বিভাগের সাহায্যও নিতে হবে। আমাদের বিভিন্ন বিভাগকেও এ কাজে এগিয়ে আসতে হবে। সহযোগিতা করতে হবে।

যে সকল উপায়ের উল্লেখ করা হলো এখানে, সেগুলো দৃষ্টান্ত মূলক। এ ধরনের যত উপায় থাকতে পারে তা অবলম্বন করতে হবে। জাতির এই দৈন্য ঘুচাতে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। বিহারের ডাঃ সৈয়দ মামুদ এক সময় ব্ল্যাকবোর্ড আর চক নিয়ে গিয়ে স্থানে স্থানে বক্তৃতা করেছেন। মাদ্রাজের রাজাগোপালাচারী এক সময়

নিরক্ষর বয়স্কদের জন্য বই লেখার কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। আমাদের যে আন্দোলন চালাতে হবে, তার অগ্রভাগে থাকবেন নেতারা। দেশের স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানগুলো এটাকে করবে তাদের অন্যতম কর্মসূচী। সাক্ষর ব্যক্তিরা অপরকে সাক্ষর করে তোলার দায়িত্ব গ্রহণ করবে। দেশের শিক্ষকরা ও ছাত্ররা পুণ্যব্রত বলে গ্রহণ করবে নিরক্ষরকে বিদ্যাদানের কাজ। তার সঙ্গে সঙ্গে সহযোগিতা করবে সরকার। তাতেই কাজ সফল হবে।

তের

নিরক্ষরতা দূরীকরণে গ্রন্থাগার

নিরক্ষরতা দূরীকরনের ফল স্থায়ী করতে হলে বা কোন দেশ থেকে নিরক্ষরতাকে পুরোপুরি নির্মূল করতে হলে নিরক্ষর ব্যক্তিদের কেবল লিখতে পড়তে শিখালেই চলবে না। এদের লেখাপড়া চর্চার সুযোগ দিতে হবে। নিয়মিত চর্চার অভাব হলে এদের অর্জিত বিদ্যা লোপ পেয়ে যায়। সাক্ষরতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা পুনরায় নিরক্ষর হয়ে যায়। এমন অনেক দেখা গেছে, কোন বালক বা বালিকা প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে তারপর আর বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করেনি। বাইরেও কোন প্রকারে বিদ্যার অনুশীলন করেনি। এই বালক বালিকা যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হয়, তখন লেখাপড়া ভুলে যায়। জীবনে নানা গরজে কয়েকবার নাম স্বাক্ষর করা হয়েছিল বলে হয়ত এইটুকুই কোন রকমে বজায় রাখে। যে কোন বিদ্যাই অনুশীলিত না হলে লোপ পাবার সম্ভাবনা থাকে।

অপর পক্ষে যারা অনুশীলন বা চর্চা করে, তারা যে কেবল তাদের অর্জিত বিদ্যাকে ধরে রাখতে পারে তা নয়, তারা তাদের বিদ্যার পুষ্টি সাধনও করতে পারে। বহু ব্যক্তিকে দেখা গেছে কিছু কাল বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের পর বিদ্যালয়ের সঙ্গে সংস্পর্শ বর্জন করেও নিষ্ঠা সহকারে অনুশীলনের ফলে প্রভূত জ্ঞানার্জন করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্র অপেক্ষা অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী হয়েছেন। মাত্র অনুশীলনের ফলেই এঁরা মহাজ্ঞানী হয়েছেন।

অধিকতর শিক্ষালাভের বা চর্চার সুযোগ পেতে পারে সাধারণ বিদ্যালয়ে। বয়স্কদের পক্ষে দু'কারণে সাধারণত সেটা সম্ভব হয় না। সাধারণ বিদ্যালয়ে শিশুদের সঙ্গে বয়স্করা পড়াশুনা করতে চাইবে না। সে পরিবেশ তাদের শিক্ষার পক্ষে অনুকূলও নয়। দ্বিতীয় কারণ হলো দিনের বেলা যখন বিদ্যালয়ের কাজ চলে, তখন বয়স্ক সদ্য-সাক্ষরগণ

সাধারণত কর্মান্তরে ব্যস্ত থাকে। তখন তারা জীবিকার সন্ধানে রত থাকে। কোন কোন দেশে এ ধরনের লোকেদের অধিকতর শিক্ষা লাভের সুযোগ দিবার জন্য সন্ধ্যায় বা রাত্রিতে বিদ্যালয় পরিচালনা করা হয়। এই সকল বিদ্যালয়ে শিক্ষাদান পদ্ধতিও একটু বিশেষ ধরনের থাকে। বিশেষ ধরনের পদ্ধতিতে অল্প সময়ের মধ্যে এদের শিক্ষাদান সম্ভব হয়। পশ্চিমবঙ্গে এ ধরনের কুড়িটি উচ্চতর বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। কিন্তু এ ধরনের বিদ্যালয় বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংখ্যায় অনেক নয়, তা হতেও পারে না।

তাহলে প্রশ্ন উঠে, সদ্য সাক্ষরদের পড়াশুনার চর্চার সুযোগ ব্যাপক ভাবে কি করে দেওয়া চলে। এ সুযোগ দেওয়া যায় গ্রন্থাগারে। মানুষ নিজ নিজ ইচ্ছা মত পাঠের মাধ্যমে বিদ্যানুশীলনের উদার সুযোগ পায় গ্রন্থাগারে। এখানে তারা নিজ নিজ অভিরুচি এবং অবসর মত অধ্যয়ন দ্বারা জ্ঞান সংরক্ষণ এবং সংবর্ধনের পথ পায়। এ সুযোগ শিক্ষিতের কোন শ্রেণী বিশেষের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। এখানে অনুশীলন করতে পারে সদ্যসাক্ষরগণ, স্বল্পশিক্ষিতগণ, এমন কি বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠসমাপনকারীরাও। স্কুল, কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থাগারের সাহায্য নিতে হয়। যে কোন পর্যায়ের আনুষ্ঠানিক শিক্ষা শেষ করেও বিদ্যার্থীকে গ্রন্থাগারের ব্যাপক সাহায্য নিতে হয়। অবশ্য বর্তমান প্রবন্ধে কেবল সদ্যসাক্ষরদের চর্চার সুযোগের কথাই আলোচ্য।

নিরক্ষর বয়স্ক ব্যক্তিগণ আনুষ্ঠানিক ভাবে শিক্ষাকেন্দ্রে যেটুকু শিক্ষালাভ করে তা অকিঞ্চিৎকর। পরবর্তী অনুশীলনই তাদের সেই শিক্ষাকে কার্যকরী করতে পারে। তারা পাঠানুশীলন করবে গ্রন্থাগারে। গ্রন্থাগারে এদের জন্য বিশেষ শাখা থাকা প্রয়োজন। সে শাখার জন্য সদ্যসাক্ষরদের উপযোগী পৃথক ধরনের এবং প্রয়োজনীয় বেশ কিছু সংখ্যক বই থাকা প্রয়োজন। উপযোগী বলতে বুঝা যায়, সে সকল বই, যেগুলো সদ্যসাক্ষর ব্যক্তিগণ অনায়াসে পড়তে পারে।

শুধু তাই নয় সেই সকল বই যে সকল বই তারা পড়ে বুঝতে পারে। আর প্রয়োজনীয় বলতে সেই ধরনের বই বুঝা যায়, যে সকল বই তাদের জীবনের এবং জীবিকার গরজের কথা মনে রেখেই লেখা হয়েছে। যেমন যে অঞ্চলের লোকেদের জীবিকার প্রধান উপায় কৃষি সে অঞ্চলের সন্থসাক্ষরদের প্রয়োজনীয় হবে কৃষি সমবায় প্রভৃতি সংক্রান্ত বই। তাছাড়া দেশের ইতিহাস, চলতি খবর, সাধারণ বিজ্ঞান, জীবনী প্রভৃতির বইও এদের প্রয়োজনীয়।

গ্রন্থাগারে কেবল উপযোগী এবং প্রয়োজনীয় গ্রন্থের সংগ্রহ থাকলেই চলে না। সেই গ্রন্থগুলোর সঙ্গে সন্থসাক্ষরদের যোগ সাধন করিয়ে দেবার মত একজন যোগ্য গ্রন্থাগারিক থাকা প্রয়োজন। কোন গ্রন্থ পাঠে তাদের উপকার সাধিত হবে, কোন গ্রন্থ তারা সহজে আয়ত্ত করতে পারবে বা কোন গ্রন্থ তাদের মানসিক আনন্দ বিধান করতে পারবে সন্থসাক্ষর ব্যক্তিগণ বা স্বল্পশিক্ষিত ব্যক্তিগণ তা নিজে জানে না। এসকল বিষয়ে তাদের সহায়তা করবে গ্রন্থাগারিক। ছোটখাট গ্রন্থাগারে এধরণের উপযোগী গ্রন্থ অনেক থাকতে পারে না। কাজেই গ্রন্থাগারিকের পক্ষে সহায়তা করা তেমন কঠিন কাজও নয়। বৃহদায়তন গ্রন্থাগারে এ ধরণের গ্রন্থের সংগ্রহও বৃহদাকার হতে পারে। সেখানে নির্দেশদানও একটু শ্রমসাধ্য ব্যাপার। তবে সেখানকার গ্রন্থাগারিকগণ অধিকতর কুশলী হয়ে থাকে। কাজেই কাজের তেমন কোন অসুবিধা হয় না।

সুষ্ঠু পরামর্শ অনুসারে পরিচালিত পঠন নবশিক্ষিতদের অর্জিত বিদ্যার সংরক্ষণ এবং সংবর্ধনের কাজে সহায়তা করে। কেবল তাই নয়। যে অবসর সময়টা পল্লীবাসীরা পরনিন্দা পরচর্চায় কাটিয়ে নিজের এবং সমাজের অকল্যাণ সাধন করে, সে সময়টা বই পড়ে তারা নির্দোষ আনন্দে কাটাতে পারে। তাতে তাদের সাংস্কৃতিক জীবনটা সুসংস্কৃত হয়।

কোন কোন গ্রন্থাগার কেবল সন্থসাক্ষরদের অনুশীলনের সুযোগ

দিয়েই ক্ষান্ত হয় না। নিরক্ষরদের সাক্ষর করে তোলার দায়িত্বও গ্রহণ করে। পশ্চিমবঙ্গের পল্লী গ্রন্থাগারগুলোকে যে সকল শর্তে সরকারী সাহায্যদান করা হয়, তার অন্যতম শর্ত হলো, নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য বয়স্ক-শিক্ষা-কেন্দ্র পরিচালনা করতে হবে। গ্রন্থাগারের মনোরম পরিবেশে বয়স্ক শিক্ষার কাজ চলেও বেশ সুন্দরভাবে।

গ্রন্থাগারগুলো অনুশীলনের সুযোগ দিতে পারে সবচাইতে বেশী সংবাদপত্রের মাধ্যমে। সদ্যশিক্ষিতদের মধ্যে একবার নতুন নতুন সংবাদ জানার আগ্রহ জাগিয়ে তুলতে পারলে এবং সেই আগ্রহ মিটাবার মত উপযোগী সংবাদপত্র গ্রন্থাগারে রাখা হলে, সদ্যসাক্ষর লোকেরা বা অল্প লেখাপড়া জানা লোকেরা আগ্রহের তাড়নায় রোজ নতুন সংবাদ সংগ্রহ করতে আসবে, খবরের কাগজ পড়বে। ফলে তাদের একদিকে যেমন অর্জিত বিদ্যার সংরক্ষণ এবং সংবর্ধন হবে অপরদিকে নাগরিক কর্তব্য এবং অধিকার বোধও পুরোপুরি বেড়ে যাবে।

সদ্যসাক্ষরদের উপযোগী সংবাদপত্র বাংলাভাষায় প্রায় নেই বললেই চলে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার জনশিক্ষা নামে একখানা মাসিক পত্র প্রকাশ করে থাকেন। সে পত্রে দৈনন্দিন ঘটনার খবর থাকে না। ছোট খাট প্রবন্ধ বা গল্পই থাকে বেশী। তা ছাড়া গোটা মাসের তু'একটা বিশিষ্ট খবরও থাকে। সদ্যসাক্ষররা তা পড়ে আনন্দ পায়, শিক্ষাও পায়। কিন্তু খবর জানার আগ্রহ তাদের তাতে মেটেনা।

পশ্চিমবঙ্গে কয়েকটি সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠান রয়েছে যারা একই সঙ্গে তিন-চার রকমের পত্রিকা প্রকাশ করে থাকে। এরা ইচ্ছা করলে সদ্যসাক্ষরদের জন্য পৃথক পত্রিকা প্রকাশ করতে পারে। সে পত্রিকা সহজ ভাষায় লেখা হবে এবং তাতে সাধারণ মানুষের অভিজ্ঞতার তথ্য বা আলোচনা থাকবে। সে ধরণের কাগজ কেবল যে

সগুসাক্ষররাই পড়বে তা নয়। তার প্রচলন সগুসাক্ষর বা অল্প-শিক্ষিতদের গণ্ডীর বাইরেও থাকবে। ফলে ব্যবসায়ের দিক থেকেও এ ধরণের সংবাদপত্র নিতান্ত ক্ষতিজনক হবে না। আর ক্ষতিজনক যদি হয়ই, তবে পত্রিকার পরিচালকরা এর জন্য সরকারী সাহায্যও পেতে পারে। যেসকল দেশ নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য একটা পরিকল্পিত অভিযান চালিয়েছে, সেই সকল দেশ এ ধরণের খবরের কাগজ প্রকাশ করে তাদের নিরক্ষরতা দূরীকরণ অভিযানকে জোরদার করেছে।

গ্রন্থাগারে রাখার জন্য গ্রন্থের তালিকা প্রণয়ণে প্রায়ই গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ সগুসাক্ষরদের স্বার্থের কথাটা যথাযথ ভাবে বিবেচনা করে না। শিক্ষিত পাঠকরা তাদের প্রয়োজনীয় বইএর নাম জানে। কর্তৃপক্ষকে সেগুলো সম্বন্ধে অবহিত করায়। কর্তৃপক্ষ তাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে শিক্ষিতদের গরজ মিটাবার মত বই-ই অধিক সংখ্যক ক্রয় করে। সগুসাক্ষররা তাদের গরজের খবর রাখে না। কাজেই পুস্তকের তালিকায় কি নাম উঠল বা উঠল না তারা সেখবর রাখা প্রয়োজন মনে করে না। ফলে তাদের প্রয়োজন কোণঠাসা হয়ে যায়। গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষকে মনে রাখতে হবে, যে দেশের অধিক-সংখ্যক লোক স্বল্পশিক্ষিত, কিছু সংখ্যক লোক সগুসাক্ষর আর অতি অল্প সংখ্যক লোক শিক্ষিত, সেদেশের গ্রন্থাগারে বিশেষ করে পল্লী-গ্রন্থাগারে সগুসাক্ষর বা অল্পশিক্ষিতদের উপযোগী বই থাকবে অনেক বেশী। সংগ্রহের জন্য তালিকা প্রণয়ণের সময় সে কথা মনে রাখতে হবে সব সময়।

উন্নত দেশগুলোতে গ্রন্থাগার চাঁদাবিহীন হয়ে থাকে। গ্রন্থাগারের সুযোগ লাভের জন্য সে সকল দেশে কোন চাঁদা দিতে হয় না। এই দেশগুলোর গ্রন্থাগার প্রকৃত জনসাধারণের গ্রন্থাগার। এই জনসাধারণের গ্রন্থাগারে জনসাধারণের জন্য ব্যবস্থা থাকে প্রচুর। সেখানে স্বল্পশিক্ষিতের জন্য ব্যবস্থা প্রায় আপনা হতেই হয়। আমাদের

মত দেশে গ্রন্থাগারগুলো টিকে থাকে জনসাধারণের অর্থসাহায্যে। অধিকসংখ্যক জনসাধারণ থেকে অর্থ সাহায্য বা চাঁদা পেতে হলে যে শ্রেণীর লোক অধিক সংখ্যক, সে শ্রেণীর উপযোগী বই রাখতে হবে বেশী। তাহলে গ্রন্থাগার অধিকতর অর্থে পুষ্ট হবে, কেবল তাই নয় গ্রন্থাগার ব্যাপক অর্থে জনসাধারণের গ্রন্থাগার হবে।

চৌদ্দ

পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা

শিক্ষার ক্ষেত্রে বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা, যেমন অপরিহার্য, গ্রন্থাগারের ভূমিকাও তেমনি অপরিহার্য। শিক্ষার্থীরা নানা ধরণের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাগ্রহণ কালে তাদের পাঠগ্রহণকে সম্পূর্ণ করার জন্য পাঠ্যপুস্তক বহির্ভূত তথ্য সংগ্রহ করে। এই সংগ্রহের কাজে সহায়তা করে গ্রন্থাগার। জ্ঞাতব্য সকল বিষয় শ্রেণীকক্ষে বিশ্লেষণ করা শিক্ষকের পক্ষে সম্ভব নয়। নির্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তকেও সকল কথা সম্পূর্ণভাবে বলা হয় না। কাজেই নানা তথ্য সংশ্লিষ্ট গ্রন্থ থেকে সংগ্রহ করতে হয়। এদিক থেকে গ্রন্থাগার শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের পরিপূরক।

আবার যারা বিদ্যালয়ের, মহাবিদ্যালয়ের বা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপন করে, তারা তাদের অধিকতর জ্ঞানের পিপাসা মিটাবার সুযোগ পায় গ্রন্থাগারে। বাস্তবিক পক্ষে বিদ্যালয় প্রভৃতি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান শিক্ষার্থীর হাতে জ্ঞানের মন্দিরের চাবিকাঠি দিয়ে দেয় আর জ্ঞানলাভের প্রবল আগ্রহ জাগ্রত করে দেয়। সেই আগ্রহে মানুষ অধিকতর পাঠের অনুশীলন করে এবং নূতুন নতুন জ্ঞানের দ্বারোদ্ঘাটন করে। কাজেই শিক্ষাগ্রহণ কালে শিক্ষার্থীর নিকট গ্রন্থাগারের যেমন প্রয়োজন, শিক্ষা সমাপনান্তেও তার কাছে গ্রন্থাগারের তেমনই প্রয়োজন।

এই তো গেলো যারা উচ্চমানেব শিক্ষা পাচ্ছে বা পেয়েছে তাদের কথা। যারা সামান্য লেখাপড়া শিখে অক্ষমতা বশতই হোক আর অনিচ্ছা বা অজ্ঞতা বশতই হোক বিদ্যালয় থেকে বিদায় নিয়েছে এবং জীবিকার তাগিদে কর্মান্তরে যোগদান করেছে, তাদের পক্ষে গ্রন্থাগার ত একেবারে অপরিহার্য। বয়স্ক নিরক্ষর যেসকল ব্যক্তি সদ্যসাক্ষর হয়েছে তাদের কথাও অনুরূপ। এরা যদি লেখাপড়ার চর্চার সুযোগ না পায়, তবে এরা বিদ্যালয়ে বা বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রে যেটুকু শিখেছে সেটুকু ভুলে যায়। এদের লেখাপড়ার চর্চার সুযোগ

দিতে পারে গ্রন্থাগার। নানা বই পড়ে এরা যেটুকু শিখেছে সেটুকু বজায় রাখতে পারে, তা' বাড়িয়েও নিতে পারে।

বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব গ্রন্থাগার আছে। কোন কোন গ্রন্থাগার গ্রন্থসম্ভারে সমৃদ্ধ এবং সুষ্ঠু-পরিচালন-পুষ্ট। সংশ্লিষ্ট শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা এসকল গ্রন্থাগার ব্যবহারের সুযোগ পেয়ে থাকে। কখনও কখনও প্রতিষ্ঠান বহির্ভূত ব্যক্তিরাও এসকল গ্রন্থাগারের সুযোগ পায়। এগুলোকে Institutional বা প্রতিষ্ঠানগত গ্রন্থাগার বলা হয়। প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ এই সকল গ্রন্থাগারের প্রতিষ্ঠাতা।

আমাদের পশ্চিমবঙ্গের নানা অঞ্চলে Institutional গ্রন্থাগার ছাড়াও আরও গ্রন্থাগার আছে। সেগুলোকে সচরাচর সাধারণ গ্রন্থাগার বা Public Library বলা হয়। বিভিন্ন উন্নত দেশে যে অর্থে Public Library কথাটি ব্যবহৃত হয়, এ Public Library ঠিক সে অর্থে Public Library নয়। সে সকল দেশে গ্রন্থাগার ব্যবহারের জন্য সভ্যদের কোন চাঁদা দিতে হয় না। কিন্তু আমাদের সাধারণ পাঠাগারের সভ্যদের চাঁদা দিতে হয়।

পশ্চিমবঙ্গে এই ধরণের সাধারণ পাঠাগার অনেক দিন ধরেই ছিল। বিভিন্ন উৎসাহী শিক্ষানুরাগীর চেষ্টায়, ধনী ব্যক্তির বদান্যতায় এবং জমিদারগণের অর্থানুকূল্যে এর অনেকগুলি গড়ে উঠেছিল। কোন কোনটির সংরক্ষণ ও পরিচালন ব্যবস্থাও বেশ ভাল ছিল। চব্বিশ পরগণা জেলার মথুরাপুরে, হাওড়া জেলার মাজুতে, হুগলী জেলার রাজবল হাটে, বর্ধমান জেলার জাড়গ্রামে এবং মুর্শিদাবাদ জেলার লালগোলায় এধরণের বেশ ভাল গ্রন্থাগার ছিল এবং সেগুলো আজও আছে। বাইর থেকে কোন প্রকারের আর্থিক সাহায্য না নিয়েও এ সকল গ্রন্থাগার বিভিন্ন অঞ্চলের পাঠক সাধারণের চাহিদা মিটাবার সকল চেষ্টা করে এসেছে। অবশ্য এ ধরণের গ্রন্থাগারের সংখ্যা যা' ছিল, প্রয়োজনের তুলনায় তা' খুব কম।

শহরাঞ্চলেও বিভিন্ন সাধারণ গ্রন্থাগার দীর্ঘকাল ধরেই শিক্ষিত জনসাধারণের পাঠেচ্ছা মিটিয়ে আসছে। কলকাতার রামমোহন লাইব্রেরী, হেমচন্দ্র পাঠাগার, মেদিনীপুরের বিদ্যাসাগর লাইব্রেরী হুগলীর উত্তরপাড়া পাবলিক লাইব্রেরী, বাঁশবেড়িয়া পাবলিক লাইব্রেরী প্রভৃতির নাম এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

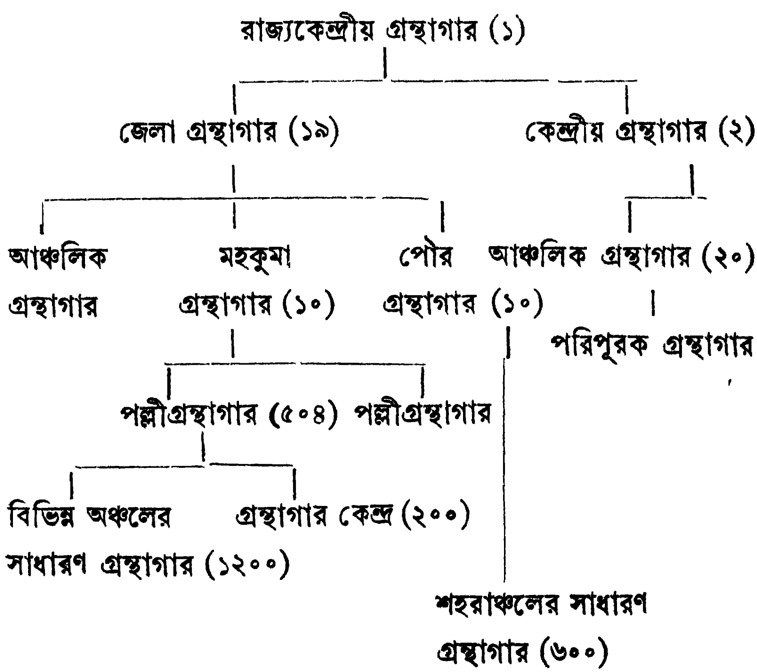
এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন অঞ্চলে ছোটখাট অনেক গ্রন্থাগারই নিজ নিজ এলাকায় পাঠক সাধারণের চাহিদা সম্ভব মত মিটিয়ে আসছিল। অবশ্য অনেক ক্ষেত্রেই অর্থের অভাবে বা উৎসাহী লোকের অভাবে এই সকল গ্রন্থাগার সন্তোষজনক ভাবে কাজ করতে পারেনি। তৎকালীন বিদেশী সরকার এই সকল গ্রন্থাগারের প্রতি ঔদাসীন্য দেখিয়েছে। এমন কি কোন কোন ক্ষেত্রে এগুলোকে বিপ্লবীদের আস্তানা মনে করে পরোক্ষভাবে এগুলোর কাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি করেছে। যেগুলো সরকারী আক্রোশের হাত থেকে রেহাই পেয়েছে, সেগুলোও নিজেদের দৈন্য এবং সরকারী ঔদাসীন্য বশত ভাল ভাবে কাজ করার সুযোগ পায়নি।

স্বাধীনতা লাভের পর আমাদের দেশের সরকার গ্রন্থাগার ব্যবস্থা উন্নয়নের দিকে মনোযোগ দিয়েছে। দেশের সর্বত্র পাঠক সাধারণ যাতে গ্রন্থাগারের সুযোগ সুবিধা পেতে পারে, সে জন্য পরিকল্পনা রচনা করা হয়েছে এবং সে পরিকল্পনা অনুসারে কাজ এগিয়ে চলেছে। ফলে আজ দেশের সর্বত্র, কি শহরে কি পল্লী অঞ্চলে, একদিকে যেমন পুরাতন গ্রন্থাগারগুলো নবীন উৎসাহে কাজ আরম্ভ করেছে, অপর দিকে এখানে সেখানে নতুন নতুন গ্রন্থাগার গড়ে উঠছে। আজ পশ্চিমবঙ্গে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাগারের সংখ্যা হয়েছে ন্যূনাধিক দু'হাজার, এগুলোর মোট গ্রন্থসংখ্যা পঁয়ত্রিশ লক্ষ এবং পাঠকসংখ্যা সাতলক্ষ।

এখন পশ্চিমবঙ্গে ধীরে ধীরে সরকারী পরিকল্পনানুসারে এক সুষ্ঠু গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। বিভিন্ন পর্যায়ের গ্রন্থাগার কর্মসূত্রে পরস্পরের সঙ্গে গ্রথিত হয়েছে এই ব্যবস্থায়। সর্বোপরি রয়েছে

রাজ্যের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, তারই নিম্ন পর্যায়ের গ্রন্থাগার হলো উনিশটি জেলা গ্রন্থাগার এবং দুটি কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার। জেলা গ্রন্থাগারের নিম্নতর পর্যায়ে রয়েছে মহকুমা বা পৌর গ্রন্থাগার, আর কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের নিম্ন পর্যায়ে রয়েছে আঞ্চলিক গ্রন্থাগার। মহকুমা গ্রন্থাগারের নিম্নতর পর্যায়ে রয়েছে পল্লী গ্রন্থাগার (Rural Library), পৌর গ্রন্থাগারের নিম্নতর পর্যায়ে রয়েছে শহরাঞ্চলের সাধারণ পাঠাগার, আর আঞ্চলিক গ্রন্থাগারের নিম্নতর পর্যায়ে রয়েছে পরিপূরক গ্রন্থাগার বা Feeder Library। পল্লী গ্রন্থাগার বা Rural Libraryগুলোর নিম্নতর পর্যায়ে বা সর্বনিম্ন পর্যায়ে রয়েছে পল্লী অঞ্চলের বিভিন্ন সাধারণ পাঠাগার।

একটি চিত্রের সাহায্যে এ ব্যবস্থাটিকে নিম্নরূপ দেখান যেতে পারে :



এই সুসংবদ্ধ ব্যবস্থা অনুসারে প্রত্যেকটি গ্রন্থাগার অপর

গ্রন্থাগারের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে হোক আর পরোক্ষভাবে হোক যুক্ত রয়েছে। একটির সঙ্গে অন্যটির কোন প্রতিযোগিতা নেই। বরং সম্পূর্ণ সহযোগিতা রয়েছে। অবশ্য কোনটির উপর কোনটির কর্তৃত্ব নেই। এদের সংযোগের সূত্র হলো সহযোগিতা এবং সেবা। গ্রন্থঋণ এবং পরামর্শ দানের মাধ্যমে পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতার ভাব বজায় থাকে। সুদূর পল্লী অঞ্চলের কোন গ্রন্থাগার একখানা বইএর প্রয়োজন বোধ করলে পল্লী গ্রন্থাগার, মহকুমা গ্রন্থাগার, জেলা গ্রন্থাগার বা রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার থেকে সেই গ্রন্থাগার তা পেতে পারে। বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে গ্রন্থাগার পরিচালন সংক্রান্ত কোন পরামর্শ যে কোন পর্যায়ের গ্রন্থাগার উপরের পর্যায়ের যে কোন গ্রন্থাগার থেকে পেতে পারে। নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে বিভিন্ন পর্যায়ের গ্রন্থাগার প্রচলিত ব্যবস্থার উন্নতি বিধান করতে পারে।

রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার সর্বোচ্চ পর্যায়ের গ্রন্থাগার। এ গ্রন্থাগারটি কলকাতার উপকণ্ঠে ব্যারাকপুর ট্র্যাঙ্ক রোডের ধারে অবস্থিত। এর শিশুশাখা, মহিলাশাখা, সাধারণ পাঠকক্ষ, গ্রন্থযান শাখা প্রভৃতি কয়েকটি বিশেষ শাখা রয়েছে। রাজ্যের দূরতম কোণ থেকে একজন পাঠক তার নিকটবর্তী সাধারণ বা পল্লীপাঠাগারের মাধ্যমে রাজ্য-কেন্দ্রীয় পাঠাগার থেকে পড়বার জন্য বই ধার নিতে পারে। পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের লোকেরাই কেবল সরাসরি গ্রন্থ ধার নিতে পারে। এটা সম্পূর্ণ সরকার পরিচালিত গ্রন্থাগার।

নিম্নতর পর্যায়ের গ্রন্থাগার জেলা গ্রন্থাগার। চাব্বশপরগণায় তিনটি অঞ্চলের জন্য তিনটি, বর্ধমানের জন্য দু'টি, মেদিনীপুরের জন্য দু'টি এবং কলকাতা ব্যতীত অন্যান্য জেলাগুলোর জন্য একটি করে মোট উনিশটি জেলা গ্রন্থাগার রয়েছে পশ্চিমবঙ্গে। এগুলো সরাসরি রাজ্যকেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার থেকে গ্রন্থঋণ নিতে পারে এবং নিম্ন পর্যায়ের মহকুমা কিংবা পৌর গ্রন্থাগারকে গ্রন্থঋণ দিতে পারে। এগুলোতেও মহিলা এবং

শিশুদের জন্য বিশেষ শাখা রয়েছে। এর একটা গ্রন্থযান বিভাগ আছে, যার মাধ্যমে নিম্নতর পর্যায়ের গ্রন্থাগারগুলোর সঙ্গে গ্রন্থলেনদেন কার্য সম্পন্ন করা হয়। জেলা গ্রন্থাগার নিজ এলাকার বিভিন্ন গ্রন্থাগারের মধ্যে যোগাযোগের সূত্র। এগুলোর প্রতিষ্ঠানগত এবং ব্যক্তিগত সদস্য রয়েছে। সদস্যদের নির্দিষ্ট হারে চাঁদা দিতে হয়। জেলা গ্রন্থাগারের গৃহনির্মাণ ব্যয় সরকার বহন করেছে। পরিচালনের ব্যয় সরকারী সাহায্য থেকে মেটানো হয়। অবশ্য চাঁদা হিসাবে আদায়ীকৃত অর্থও জেলা গ্রন্থাগারের উন্নতিকল্পে ব্যয়িত হয়।

রাজ্য-কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের নিম্নতর পর্যায়ে জেলা গ্রন্থাগারের পাশাপাশি দার্জিলিংএর ক্যালিম্পং এবং চব্বিশপরগণার বাণীপুর অঞ্চলে দুটি কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার রয়েছে। এগুলোরও মহিলা শাখা, শিশু শাখা, ভ্রাম্যমান শাখা প্রভৃতি শাখা রয়েছে। এগুলোও রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার থেকে গ্রন্থঋণ পেতে পারে। বিভিন্ন ব্যাপারে পরামর্শ পেতে পারে। এই কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার দু'টি সরকার পরিচালিত। নির্মাণ, সংরক্ষণ এবং পরিচালন ব্যয় পুরোপুরি সরকার বহন করে থাকে।

জেলা-গ্রন্থাগারের নিম্নতর পর্যায়ে হলো মহকুমা এবং পৌর গ্রন্থাগার। সম্প্রতি দশটি মহকুমা গ্রন্থাগার এবং দশটি পৌর গ্রন্থাগার মঞ্জুর করা হয়েছে। এগুলোর নির্মাণকার্য শুরু হয়েছে। নির্মাণকার্য শেষ হলে এগুলোতে নির্দিষ্ট নিয়মে কাজ আরম্ভ হবে। জেলা গ্রন্থাগার এগুলোর কাজ আরম্ভ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত মহকুমার নিম্নতর পর্যায়ের পল্লী গ্রন্থাগারের সঙ্গে গ্রন্থঋণ কার্য চালিয়ে যাবে। মহকুমা এবং পৌর গ্রন্থাগারের গৃহনির্মাণ ব্যয়ের শতকরা সাড়ে সাতাশী ভাগ বহন করছে সরকার। এগুলোর পরিচালন ব্যয় সরকারী সাহায্য থেকে মিটান হবে। মহকুমা গ্রন্থাগারের কাজ যখন আরম্ভ হবে তখন এরা একদিকে জেলা গ্রন্থাগার অপর দিকে পল্লী গ্রন্থাগারের সঙ্গে গ্রন্থ লেনদেনের কাজ করবে। আর পৌর গ্রন্থাগার একদিকে

জেলা গ্রন্থাগার অপর দিকে পৌর অঞ্চলের সরকারী সাহায্য প্রাপ্ত সাধারণ পাঠাগারের সঙ্গে গ্রন্থ লেনদেনের কাজ করবে।

অপর দিকে কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের নিম্নতর পর্যায়ে রয়েছে কয়েকটি আঞ্চলিক গ্রন্থাগার। তাছাড়া কয়েকটি আঞ্চলিক গ্রন্থাগার রয়েছে যেগুলো যুক্ত রয়েছে জেলা গ্রন্থাগারের সঙ্গে। উভয় প্রকারের আঞ্চলিক গ্রন্থাগারই সরকারী সাহায্যে বেসরকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিচালিত। এগুলোরও বিভিন্ন শাখা রয়েছে। আঞ্চলিক গ্রন্থাগার-গুলোর নিম্নতর পর্যায়ে রয়েছে ছোট ছোট পরিপূরক গ্রন্থাগার। এগুলোর সঙ্গে আঞ্চলিক গ্রন্থাগারের গ্রন্থ লেনদেন চলে। এই পরিপূরক গ্রন্থাগার সাধারণ ব্যক্তিগত সদস্যদের গ্রন্থপাঠের সুযোগ দেয়।

মহকুমা গ্রন্থাগারের নিম্নতর পর্যায়ে রয়েছে পাঁচশ চারটি পল্লী গ্রন্থাগার বা Rural Library। সরকারী সাহায্যে এগুলোর গৃহ নির্মাণ হয়েছে। এগুলোর পরিচালনকার্য সরকারী অর্থ সাহায্যে বেসরকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সম্পন্ন হয়। এই সকল প্রতিষ্ঠান বর্তমানে জেলা-গ্রন্থাগার থেকে গ্রন্থঋণ গ্রহণ করে। পরে মহকুমা গ্রন্থাগার থেকে গ্রন্থঋণ গ্রহণ করবে, আর গ্রামাঞ্চলের বিভিন্ন সাহায্যপ্রাপ্ত সদস্য গ্রন্থাগারগুলোর সঙ্গে গ্রন্থ লেনদেনের কাজ করে। বিভিন্ন সদস্য গ্রন্থাগারের সঙ্গে দ্বিচক্রযানের (Cycle) এর সাহায্যে এই লেনদেন কাজ সম্পন্ন হয়।

সর্বনিম্ন পর্যায়ের গ্রন্থাগার হলো গ্রামাঞ্চলের সাধারণ গ্রন্থাগার। সরকারের নিকট থেকে এগুলো আসবাবপত্র এবং গ্রন্থক্রয়ের জন্য সাহায্য পায়। কয়েকটি গ্রন্থাগার গৃহ নির্মাণের জন্যও সাহায্য পেয়েছে। অন্য কোন বাবদ এগুলো সরকারী সাহায্য পায় না। এগুলোর সংখ্যা প্রায় বারশ'। পল্লী গ্রন্থাগার বা Rural Library থেকে এগুলো গ্রন্থঋণ পায়। নিজ নিজ সামর্থ্যানুযায়ী এগুলো গ্রন্থাগারের বিভিন্ন ধরণের কাজ করে। এই গ্রন্থাগারগুলো ব্যক্তিগত সদস্যদের

গ্রন্থঋণ দিয়ে থাকে এবং তাদের চাঁদা থেকে নিজেদের ব্যয়ের বিশেষ অংশ মিটিয়ে থাকে।

গ্রন্থাগার পরিচালনের জন্য বিশেষ ধরণের শিক্ষাপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিকের প্রয়োজন। সে প্রয়োজন এখন মিটাচ্ছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। প্রতি বছর আশি জন স্নাতককে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে শিক্ষাদান ক'রে। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ প্রতি বছর কিছু সংখ্যক গ্রন্থাগারিককে স্বল্পকালীন শিক্ষাদান করছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সাহায্যে রহড়া রামকৃষ্ণ মিশন বয়েজ হোম কর্তৃপক্ষ একটি গ্রন্থাগারিক শিক্ষণ কেন্দ্র পরিচালন করছে। তাতেও বছরে পঞ্চাশ জন শিক্ষার্থী গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে স্বল্পকালীন শিক্ষা লাভ করছে। সরকার স্নাতক এবং স্নাতক-পূর্ব শিক্ষার্থিগণের গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে শিক্ষাদানের জন্য একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। সে পরিকল্পনা অনুসারে গৃহনির্মাণ-কার্য শুরু হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গে যে সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে তোলা হচ্ছে বা হয়েছে তা' অন্যান্য সকল রাজ্যের বর্তমান ব্যবস্থা অপেক্ষা সুষ্ঠুতর। এই ব্যবস্থার বিভিন্ন অংশ পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতার সূত্রে আবদ্ধ। নিজ নিজ এলাকায় নির্দিষ্ট কাজ করে এগুলো রাজ্যে সুসংবদ্ধ ব্যবস্থাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করছে। আজ এই ব্যবস্থার ফলে এমনকি দূরতম পল্লী অঞ্চলের গ্রন্থাগারগুলো পর্যন্ত কর্ম চঞ্চল হয়ে উঠেছে। এদের কর্ম চাঞ্চল্য আজ শিক্ষার ক্ষেত্রে দেশবাসীর মনে নবতর আশার সঞ্চার করছে।

পনের

সদ্য সাক্ষরদের জন্য বই

সদ্য সাক্ষর ব্যক্তিরা পড়ার চর্চা না করলে তাদের অর্জিত বিদ্যা নষ্ট হয়ে যায়। তারা পুনরায় নিরক্ষর হয়ে যায়। এদের সাক্ষর করে তোলার জন্য যে শ্রম স্বীকার করা হয়েছে, বা যে অর্থ ব্যয় করা হয়েছে তা নিষ্ফল হয়ে যায়। এদের সাক্ষরতা বজায় রাখার জন্য পড়ার সুযোগ দিতে হয়। এদের শিক্ষা, প্রয়োজন, রুচি এবং বয়সের উপযোগী বই সরবরাহ করতে হয়।

স্বল্প শিক্ষিতদের জন্যও সে ব্যবস্থাই প্রয়োজন। আমাদের দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে অনেকে এমন রয়েছে যারা বড়জোর প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষা শেষ করে বিদ্যালয় পরিত্যাগ করেছে। এরাও যদি পড়ার সুযোগ না পায় তাহলে এদেরও অর্জিত বিদ্যা নষ্ট হয়ে যায়। তাই এদেরও অনুশীলনের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। এদের জন্যও উপযোগী বই থাকা চাই। এদের মধ্যে বিভিন্ন বয়সের লোক থাকা স্বাভাবিক। তাই সকলক্ষেত্রে বয়স্ক সদ্য সাক্ষরদের জন্য লেখা বই এদের উপযোগী নাও হতে পারে। সদ্য বিদ্যালয় পরিত্যাগ করে আসা বার বছরের একটি বালকের পক্ষে কোন কারিগরী বিদ্যা সংক্রান্ত লেখা বয়স্ক সদ্য সাক্ষরের একখানা বই উপযোগী না হওয়াই স্বাভাবিক। এ ধরনের দু'একটি ক্ষেত্র ছাড়া মোটামুটি যে বই সদ্য সাক্ষরদের উপযোগী, সে বই স্বল্প শিক্ষিতের উপযোগী হয়ে থাকে।

এ ধরণের বই নানা কারণে বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক বা সাধারণ পাঠকদের জন্য লেখা বই থেকে কিছুটা পৃথক। এই পার্থক্যের কথাটা সকল সময় সকলের স্মরণ থাকে না। এমন দেখা গেছে যে কোন প্রতিষ্ঠাবান প্রকাশক তাদের যে ক'খানা বইএর বাজারে

কাট্‌তি নেই, সেগুলোকে সগু সাক্ষর বা স্বল্পশিক্ষিতের বই বলে চালাবার একটা চেষ্টা করছে। অন্য সকল ক্ষেত্রে অচল বলেই এগুলো সগু সাক্ষর বা স্বল্প শিক্ষিতের উপযোগী—এটাই বোধ হয় প্রধান যুক্তি। এটাকে যুক্তির পর্যায়ে তারাই আনতে পারে, যারা কেবল নিজ স্বার্থ সিদ্ধির উপায় খোঁজে। প্রকৃতপক্ষে সগু সাক্ষর বা স্বল্প-শিক্ষিতের বই হবে বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে বিশেষ ধরণে লেখা।

আমাদের দেশের শিক্ষার বর্তমান অবস্থায় এ ধরণের বই এর প্রয়োজন খুব বেশী। দেশের লেখকদের এই বিশেষ ধরণের বই লিখতে উৎসাহ দিবার জন্য ভারত সরকার কয়েকটি প্রতিযোগিতা এবং পুরস্কারের ব্যবস্থা করেছে। পুরস্কার এবং তল্লব্ধ সম্মানের দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে কোন কোন লেখক আজকাল এ ধরণের বেশ কিছু বই লিখছেন। তার ফলেই এই ধরণের বইএর চাহিদা কিছুটা মিটছে। আবার ভারত সরকারের অর্থানুকূল্যে রাজ্য সরকারগুলোও এক ধরণের সাহিত্য রচনালয়ের ব্যবস্থা করছে। এই সকল সাহিত্য রচনালয়ে অভিজ্ঞ সাহিত্যিকের পরিচালনায় সাহিত্যিকগণ মিলিত হয়ে বিশেষ ধরনের সাহিত্য রচনার কৌশল আয়ত্ত করছেন আলোচনা এবং অনুশীলনের সাহায্যে। যোগদানকারী সাহিত্যিকগণ প্রত্যেকে অন্ততঃ একখানা করে বই রচনা করেন। এ ধরনের কর্মোদ্যোগের ফলেও সগু সাক্ষর বা স্বল্পশিক্ষিতদের উপযোগী বই এর সরবরাহ বেড়েছে।

সগু সাক্ষর বা স্বল্পশিক্ষিতদের জন্য লেখা বই এর বিশেষত্ব প্রকাশ পাবে সেই বই এর আকারে, মুদ্রণে, ছবি বিন্যাসে, শব্দ সম্ভারে, রচনা পদ্ধতিতে এবং বিষয় বস্তু নির্বাচনে। অন্য বই এর চাইতে এদের বই আকৃতি, মুদ্রণ প্রভৃতি স্বভাবতই হবে অন্য ধরনের। এই বিশিষ্টতার কারণ এবং রকমের একটু আলোচনার প্রয়োজন।

সগু সাক্ষর ব্যক্তিকে মুদ্রিত অক্ষর বা শব্দ সহজে চিনবার সুযোগ দিবার জন্য সাধারণতঃ হরফগুলো বড় করতে হয়। বড়

হরফের সাহায্যে সম্পূর্ণ কিছু লিখতে হলে বই এর পৃষ্ঠার আকারও একটু বড় হওয়া চাই। সে জন্যই বয়স্ক সদ্য সাক্ষর এমন কি স্বল্পশিক্ষিতদের জন্য মুদ্রিত প্রথম দিককার বইগুলোর আকার সাধারণ বই এর আকারের চাইতে একটু বড় হতে হয়। যে কোন একটি পৃষ্ঠায় সামান্য কটি কথা লেখা থাকলে তা পড়ে পরিপক্ক মন নিয়ে বয়স্করা তৃপ্তি লাভ করতে পারে না। তাই বড় হরফে মুদ্রিত বইএর পৃষ্ঠাগুলোর দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ স্বভাবতঃই একটু বড় হয়। অবশ্য উচ্চতর মানের বইগুলোর আকৃতি সাধারণ বইএর আকৃতির মত হলে তাতে তেমন কোন অসুবিধা হয় না। সঙ্গীত কিংবা ছোট কবিতার বই আকারে তদধিক ছোট হলেও কোন অসুবিধা হয় না। একটি পূর্ণ কবিতা বা সঙ্গীত এক পৃষ্ঠায় সন্নিবিষ্ট হলেই চলে।

সদ্য সাক্ষর বা স্বল্পশিক্ষিতের বই বহু পৃষ্ঠা সম্বলিত হওয়া উচিত নয়। কোন বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনার জন্যই বহু পৃষ্ঠা সংযোজনের প্রয়োজন হয়। তর্ক বহুল দীর্ঘ আলোচনা এদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটায় এবং বিরক্তি উৎপাদন করে। একাধিক বিষয়ের আলোচনাও এ ধরনের বইতে বাঞ্ছনীয় নয়। সদ্য সাক্ষরদের বইএর পৃষ্ঠা সংখ্যা সাধারণত চল্লিশ থেকে পঞ্চাশের মধ্যে হওয়াই ভাল। প্রকাশকদের দিক থেকে বোধ হয় এই বইএর পৃষ্ঠা সংখ্যা আট চল্লিশ হলেই ভাল হয়। এই বইএর কাগজগুলো একটু মজবুত হওয়া প্রয়োজন। সদ্য সাক্ষর বা স্বল্পশিক্ষিত ব্যক্তির পক্ষে পুনঃপুনঃ পৃষ্ঠা পরিবর্তন বা হস্ত সঞ্চালন মোটেই অস্বাভাবিক নয়। কাগজ একটু মজবুত হলে পুনঃপুনঃ ব্যবহারের ফলে বইখানা দ্রুত নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকে না। মজবুত মোটা কাগজের আর একটা সুবিধা হল এক পৃষ্ঠার মুদ্রিত অক্ষর অপর পৃষ্ঠার মুদ্রিত অক্ষরকে অস্পষ্ট বা ঝাপসা করে দিতে পারে না। বইএর প্রচ্ছদপট একটু মনোরম হলে সে বই সহজে এ ধরনের পাঠককে আকৃষ্ট করে। বইএর বিষয় বস্তু আয়ত্ত করার জন্য অনেক বই সদ্য সাক্ষর বা স্বল্পশিক্ষিত ব্যক্তিকে একাধিক বার পড়তে হয়। বইএর

বাঁধাই এমন হওয়া প্রয়োজন যাতে পুনঃপুনঃ ব্যবহারের ফলে সে বাঁধাই নষ্ট না হয়।

সন্থসাক্ষর বয়স্কদের জন্য মুদ্রিত বইএর হরফ বেশ বড় হবে, যাতে অক্ষর, শব্দ বা বাক্য চিনতে তাদের অসুবিধা না হয়, একথা পূর্বে বলা হয়েছে। মুদ্রণের হরফগুলোর মাপ অনুসারে এগুলোকে নানা ভাগে ভাগ করা হয়। সেই মাপ অনুসারে নব্য বয়স্ক শিক্ষার্থীদের জন্য বই ছত্রিশ পয়েণ্টে মুদ্রিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। তারপর উচ্চতর পর্যায়ের জন্য নিম্নতর পয়েণ্টের হরফ হলেই চলে। এগুলো কমাতে কমাতে চৌদ্দ এমন কি বার পয়েণ্টেও আনা যায়। প্রতিটি পংক্তির দৈর্ঘ্য চার ইঞ্চির বেশী হলে চোখের উপর চাপ পড়ে। এসকল বইএর পংক্তির মধ্যকার ব্যবধানও এমন হওয়া উচিত যেন সহজ দৃষ্টির সাহায্যে সেগুলোকে অনায়াসে পৃথক করে ধরা যায়।

এদের বইতে ছবির আধিক্য অপরিহার্য। অনেক ক্ষেত্রে এদের কাছে বিষয় বস্তুকে সহজ-বোধ্য করার জন্য ছবির সাহায্য নিতে হয়। এ ধরনের ছবি স্বভাবতই জটিলতা-বর্জিত এবং স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন। যে কথাটা স্পষ্টভাবে বোঝাবার জন্য ছবির প্রয়োজন, ছবিটি সেই কথাটার নিচে বা পার্শ্বদেশে বিন্যস্ত করতে হয়। বইএর লেখকগণের পক্ষে ছবি না আঁকতে পারাটা তেমন অস্বাভাবিক নয়। যে ক্ষেত্রে লেখক ছবি আঁকেন না, সে ক্ষেত্রে তাঁকে কোন নিপুণ শিল্পীর সাহায্য নিতে হবে।

সন্থ সাক্ষর বা স্বল্পশিক্ষিতের জন্য বই লেখার সময় গ্রন্থকারকে শব্দ নির্বাচনের ব্যাপারে বেশ সতর্ক হতে হয়। এদের অনেক বেশী শব্দের সঙ্গে পরিচয় থাকা স্বাভাবিক নয়। মানুষের জীবিকা, পরিবেশ প্রভৃতি আয়ত্ত-শব্দ-সম্ভারের পরিধি নির্ণয়ে সহায়তা করে। এই সব কথা মনে রেখে যে শ্রেণীর পাঠকের জন্য বই লেখা হয়, তাদের পক্ষে যে সকল শব্দের সঙ্গে পরিচয় থাকা সম্ভব, বইতে কেবল যে সকল শব্দের ব্যবহারই বাঞ্ছনীয়। বিশেষ ধরনের শব্দ

(Technical words) নিতান্ত অপরিহার্য না-হলে ব্যবহার না করাহ ভাল। এ ধরনের শব্দ ব্যবহার করতে হলে পরিচিত শব্দের সাহায্যে সেগুলোকে ব্যাখ্যা করে তারপর ব্যবহার করতে হয়। কখনও কখনও অন্য ভাষায় লেখা ভাল বইএর অনুবাদ এদের খুব উপযোগী হয়। এই অনুবাদের বইতে বিদেশী অপরিচিত বস্তু বা প্রাণীর নাম সন্নিবেশিত করতে হলে সহজ করে সে গুলোকে ব্যাখ্যা করে দিতে হয়। একেবারে আক্ষরিক অনুবাদ অনেক সময় উপযোগী হয় না। প্রত্যেক ভাষারই রচনা রীতির একটা বিশিষ্টতা আছে। সেই বিশিষ্টতা বজায় রেখে অন্য ভাষায় কোন লেখাকে হুবহু অনুবাদ করলে নতুন পাঠকদের অসুবিধা হওয়া স্বাভাবিক। কারণ বিদেশী ভাষার রচনারীতির সঙ্গে তাদের পরিচয় নেই। কাজেই এদের ক্ষেত্রে ভাবানুবাদই শ্রেয়। এদের বইতে নতুন শব্দের ব্যবহার হলে লক্ষ্য রাখতে হয় যেন, সে নতুন শব্দ কয়েক বার ব্যবহৃত হয়। তাতে শব্দটি তার পরিচিতের পর্যায়ে এসে পড়ে।

সদ্য সাক্ষর বা স্বল্পশিক্ষিতের কাছে যাতে সহজ বোধগম্য হয় সেজন্য তাদের বইএর ভাষা সরল, ঋজু এবং যথাসম্ভব অলঙ্কার বর্জিত হবে। বহু অলঙ্কার-ভারাক্রান্ত ভাষা থেকে আসল বক্তব্য উদ্ধার করা সামান্য শিক্ষিতের পক্ষে দুরূহ কাজ। পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাষা পরোক্ষোক্তি এদের কাছে যেমন নিরর্থক তেমন নিষ্প্রয়োজন। কখনও কখনও কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হবার আগে গ্রন্থকার নানা জটিল তর্কের অবতারণা করার লোভ সম্বরণ করতে পারেন না। মনে রাখা সমীচীন যে, এ ধরনের জটিল তর্কের বেড়াজালে সদ্য-সাক্ষর আটকা পড়ে যায়, অল্প আয়াসে অল্প সময়ে শিক্ষা লাভের ভরসা এতে তাদের নষ্ট হয়।

সদ্যসাক্ষরদের বইএর বক্তব্য বিষয় একটু সরস ভাবে পরিবেশনের চেষ্টা করা সঙ্গত। বর্ণনার সরসতা তাদের পাঠে আকৃষ্ট করতে পারে। জটিল বৈজ্ঞানিক সত্যও একটু সরসভাবে পরিবেশিত হলে এরা সহজে

তা আয়ত্ত করতে পারে। এরা জ্ঞানলাভের আশায় কৃচ্ছ্রসাধনে রাজী হবে, তেমন ভরসা করা ঠিক নয়। বর্ণনা ভঙ্গীতে এরা আকৃষ্ট হতে পারে। বর্ণনায় রসসিক্ত কাহিনীর, নাটকীয় ঘটনার বা বিস্ময়কর পরিবর্তনের অবতারণা এদের আগ্রহকে উদ্দীপিত করে। একঘেয়ে বর্ণনা এদের উৎসাহকে স্তিমিত করে।

ভাব বা বিষয়বস্তুর ঐক্যের কথা গ্রন্থকারকে মনে রাখতে হয়। প্রতিপাদ্য বিষয়কে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য যতটুকু তথ্য, যুক্তি বা বর্ণনার প্রয়োজন ততোধিক তথ্য, যুক্তি বা বর্ণনার অবতারণা অবাঞ্ছনীয় বাহুল্য মনে করা প্রয়োজন। বাহুল্য নিশ্চিত ভাবে বিরক্তি উৎপাদন করে।

বিষয়বস্তু নির্বাচনে গ্রন্থকারকে রীতিমত বিচক্ষণতার পরিচয় দিতে হয়। বর্তমান পৃথিবীতে একজন সাধারণ মানুষেরও জ্ঞাতব্য বিষয়ের পরিধি সুবিস্তৃত। একজন সভ্যসাক্ষরকে তার অতি প্রয়োজনীয় অংশ আয়ত্ত করেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে। এ সকল লোক যে পরিবেশে বাস করে, যে বৃত্তি অবলম্বন করে জীবিকা অর্জন করে, তা সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের ইচ্ছা তাদের মনে থাকা স্বাভাবিক। এ জ্ঞান তাদের পক্ষে প্রয়োজনীয়ও বটে। কৃষির পরিবেশে যারা বাস করে, কৃষি যাদের জীবিকা, কৃষি সম্বন্ধে নানা তথ্য জানার আগ্রহ তাদের থাকা স্বাভাবিক। আর সে তথ্য জানা থাকলে তাদের এবং দেশেরও মঙ্গল। তাই কৃষি সংক্রান্ত নানা তথ্য তাদের বইএর বিষয়বস্তু হতে পারে। যে দেশে তারা বাস করে তার সম্বন্ধে নানা তথ্য সকল নাগরিকেরই জানা প্রয়োজন। দেশের অবস্থান, জলবায়ু, ইতিহাস, রাজনৈতিক ব্যবস্থা, অর্থ নৈতিক অবস্থা প্রভৃতি সভ্যসাক্ষরদের বইএর বিষয়বস্তু হতে পারে। নিজেদের প্রতিবেশীকে জানা সকলেরই উচিত। প্রতিবেশীর পরিচয়ও এদের বইএর বিষয়বস্তু হতে পারে। ধর্মের নির্দেশ বা মহাজনের জীবনী জানা থাকলে এরা নিজের জীবনের পথকে সুনিয়ন্ত্রিত করতে পারে। কাজেই এগুলো নিয়েও সভ্যসাক্ষরদের

জন্যে বই লেখা চলে। প্রতিদিন যে সকল ঘটনা ঘটছে, যে সকল ঘটনা সাধারণ মানুষের জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করছে, যে সকল নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার মানুষের জীবন যাত্রার পথ সহজ থেকে সহজতর করে দিচ্ছে, সে সকল দৈনন্দিন ঘটনা এবং বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারও তাদের বইএর বিষয়বস্তু হতে পারে। তথ্য জটিল হলে, বর্ণনাভঙ্গি সহজ সরল হলে, তথ্যের জটিলতা গুরুতর বাধার সৃষ্টি করে না।

সদ্যসাক্ষর বা স্বল্পশিক্ষিতের জন্য যিনি পুস্তক রচনা করবেন, ভাষার উপর তাঁর বিশেষ দখল থাকা প্রয়োজন। তাঁর দায়িত্ব গুরুতর, কাজ কঠিন। জটিল প্রশ্নের সহজ সমাধান আর জটিল তথ্যের সহজ পরিবেশন কেবল কুশলী লেখকের পক্ষেই সম্ভব। এ বইএর লেখককে সকল সময় স্বল্পশিক্ষিতের পঠন-যোগ্যতা, তার প্রয়োজন ও তার রুচি সম্বন্ধে সচেতন থাকতে হয়। এই সচেতনতা এবং বর্ণনার কৌশলে মূলধন থাকলেই গ্রন্থকার সদ্যসাক্ষর বা স্বল্পশিক্ষিতের জন্য সার্থকভাবে বই লিখতে পারবেন।

(ষোল)

আনন্দানুষ্ঠান ও লোকশিক্ষা

বিভিন্ন ধরণের আনন্দানুষ্ঠান আমাদের দেশে এক দিকে যেমন সমাজের বিভিন্ন স্তরের লোকেদের মনে আনন্দ বিধান করেছে, অপরদিকে তাদের শিক্ষাও দান করেছে। কর্মক্লান্ত জনসাধারণ উন্মুক্ত প্রাঙ্গনে অথবা জমিদারের আটচালার আশ্রয়ে দিবাবসানে যাত্রা, কবি, তর্জা, কীর্তন, কথকতা শুনে বা লোকনৃত্য, লাঠি খেলা প্রভৃতি দেখে আনন্দে উল্লসিত হয়ে শ্রান্তি ভুলে গিয়েছে। তারা ধর্মের জয়, অধর্মের পরাজয়, ত্যাগের গরিমা, স্বার্থান্বেষণের লাঞ্ছনা, দেশপ্রেমের মহিমা আর দেশদ্রোহিতার গ্লানি সম্মুখে গীত হতে শুনে বা অভিনীত হতে দেখে দৈনন্দিন জীবনে নিজেদের কর্তব্য নির্ধারণ করেছে। জীবনের অতি প্রয়োজনীয় শিক্ষা তারা এর মধ্যে বহুক্ষেত্রে নিজের অজ্ঞাতসারে অথচ নিশ্চিতরূপে পেয়েছে। বিদেশী সভ্যতার অবাঞ্ছিত প্রভাবে এই সকল জনপ্রিয় লোকশিক্ষার উপায়গুলো অনাদরের গ্লানি শিরে বহন করে কোন কোন ক্ষেত্রে প্রায় লোপ পেতে বসেছিল। কোন কোন ক্ষেত্রে তারা আত্মরূপ গোপন করে ভিন্নরূপে নিজেকে কায়ক্লেশে বাঁচিয়ে রেখেছিল। স্বাধীন ভারতের কল্যাণকামী সরকার এগুলোর প্রয়োজনীয়তা এবং উপযোগিতা উপলব্ধি করে এগুলোকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য নানাভাবে সচেষ্ট হয়েছে।

আনন্দলাভের আকাঙ্ক্ষা মানুষের মনের এক অতি স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা। এর প্রয়োজনও তার কাছে খুব বেশী। দেহের পুষ্টি বিধানের জন্য যেমন চাই খাদ্য, মনের পুষ্টি বিধানের জন্য তেমন চাই আনন্দ। যারা কঠোর পরিশ্রম ক'রে জীবিকা অর্জন করে, তাদের কাছে এর প্রয়োজন আরও বেশী। পরিশ্রমে অবসন্ন দেহকে

অবসাদের হাত থেকে নিষ্কৃতি দিতে আনন্দের বুঝি বা জোড়া নেই। শ্রমক্লান্ত মানুষের মনে অবসর সময়ে আনন্দ বিধান হলে তাদের অবসন্ন দেহমন পুনরায় পরিশ্রমের জন্য সহজে প্রস্তুত হয়। ভারতের মত দেশে যেখানে প্রায় সকল লোককেই কঠোর পরিশ্রম ক'রে জীবিকা অর্জন করতে হয়, সেখানে আনন্দানুষ্ঠানের মূল্য নিরূপণ কঠিন কাজ।

শিক্ষার দিক থেকেও আমাদের দেশের মত দেশে আনন্দানুষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করার জো নেই। আমাদের নিরক্ষর জনসাধারণ প'ড়ে যা জানার সুযোগ পায়না, তারা তা আহরণ করতে পারে অভিনয়, নৃত্য, গীত প্রভৃতি থেকে অতি সহজে। এ থেকে সামান্য যে শিক্ষা তারা পায় তা হয় কিন্তু খুব স্থায়ী।

নানা বৈজ্ঞানিক উন্নতির ফলে সৌভাগ্যবশতঃ মানুষের পরিশ্রমের কিছুটা লাঘব ঘটেছে। তাদের অবসর কিছুটা বেড়েছে। সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জীবনের সমস্যাও যে বাড়েনি তা নয়। বহু লোক পরিশ্রমের পর অবসর বিনোদনের নানা অবাঞ্ছনীয় উপায় অবলম্বন করতে প্রলুব্ধ হচ্ছে। পরিশ্রমের পর কোন কোন ক্ষেত্রে লোকেরা নিভৃত স্থানে আশ্রয় নিয়ে মদ্যপান প্রভৃতিতে কালক্ষেপ করছে। এরা সাময়িক ভাবে নিজেদের মনের আনন্দ বিধান করে এবং দেহের ক্লান্তির কিছুটা হয়ত লাঘব ঘটায়। কিন্তু পরিণামে এরা নিজেদের সর্বনাশ সাধন করে এবং পারিবারিক ও সামাজিক জীবন বিপন্ন করে। এরা নিজেদের অযথা অর্থহানি ঘটিয়ে স্বাস্থ্য এবং শান্তি নষ্ট করে। অপর দিকে নিজ পরিবার এবং সমাজ থেকে এরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। তাতে পরিবারের ও সমাজের অকল্যাণ হয়। অথচ এদের আনন্দ বিধানের জন্য যদি আমাদের যাত্রা, কবি, কথকতা, কীর্তন, তর্জা, লোকনৃত্য প্রভৃতির উদার ব্যবস্থা থাকে তাহলে এদের মনের আনন্দ বিধানের এবং শিক্ষার অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে যায়।

চিত্তবিনোদনের জন্য যাত্রা, কবি প্রভৃতি যে সকল আনন্দ-

অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা যায়, সেগুলোতে লোকেরা দুভাবে যোগদান করতে পারে। অধিক সংখ্যক লোক যোগদান করে শ্রোতা বা দর্শক হিসাবে। অল্প সংখ্যক লোক এতে যোগদান করে নিজেরা অভিনয় নৃত্য, গীতাদি ক'রে। শ্রোতা বা দর্শকদের আনন্দ প্রায় অনায়াসলব্ধ। সে আনন্দের পরিমাণ কিন্তু সেজন্য কম নয়। এদের শিক্ষা হয় সুনিশ্চিত রূপে। আমাদের দেশে এমন অনেক লোক আছে যারা কোন ক্রমেই লেখাপড়া করতে রাজী নয়। এদের পক্ষে আনন্দানুষ্ঠানের মাধ্যমে শিক্ষা খুব উপযোগী। এরা চোখের সামনে পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক ঘটনা অভিনীত হতে দেখে বা কথকতার মাধ্যমে ন্যায় অন্যায়ের পরিণতি দেখে যে শিক্ষা পায় সে শিক্ষা পড়ার সাহায্যে প্রাপ্ত শিক্ষা অপেক্ষা কম মূল্যবান নয়। এ শিক্ষার ফলও বেশ স্থায়ী হয়। পঠিত বিষয় একাধিক বার পঠিত না হলে মন থেকে মুছে যাবার আশঙ্কা থাকে। কিন্তু গীত বা অভিনীত ঘটনাবলী মনের উপর যে সুস্পষ্ট ছাপ রাখে, তা সহজে মুছে যাবার আশঙ্কা থাকে না।

দর্শক বা শ্রোতারা নানা বিচিত্র ধরণের শিক্ষা পেতে পারে এই আনন্দানুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে। দেশের নানা সমস্যার কথা এই সকল অনুষ্ঠানের মাধ্যমে লোকেদের কাছে সফল ভাবে পরিবেশন করা যায়। এগুলোর মাধ্যমে লোকেরা তাদের প্রতিবেশীকে জানতে পারে। নিজেদেরও অধিকতর পরিচয় পায়। অভিনয়ের চরিত্রগুলো যে হয়ত তারা নিজেরা বা তাদের প্রতিবেশী, এটা বুঝাও তাদের পক্ষে কঠিন নয়। তাদের প্রতিবেশীদের জানতে পেরে, নিজেদের ভাল ক'রে জানতে পেরে ওরা নানা কাজে অধিকতর বুদ্ধির পরিচয় দেয়। ওদের মনের সদ্বৃত্তিগুলো সহজে সজাগ হয়। মনের উদারতা বৃদ্ধি পায়।

আনন্দানুষ্ঠানের মাধ্যমে যে শিক্ষা তার আর একটি বিশেষ সুবিধা রয়েছে। শ্রেণীকক্ষে একজন শিক্ষক এক সঙ্গে ত্রিশ কি চল্লিশ

জন শিক্ষার্থীকে শিক্ষা দিতে পারে। কিন্তু যাত্রা, কবি, কীর্তন, চর্চা, কথকতা প্রভৃতি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এক সঙ্গে সহস্র লোককে শিক্ষাদান করা চলে। অনিচ্ছার গুরুবাধা কখনও কখনও শ্রেণীকক্ষে শিক্ষকের কাজকে দুরূহ করে তোলে। কিন্তু আনন্দানুষ্ঠানের মাধ্যমে যারা শিক্ষালাভ করে, তারা স্বেচ্ছায় সাগ্রহে শিক্ষালাভ করে। কথনও কখনও এ শিক্ষা হয় তাদের অজ্ঞাতসারে।

যারা নৃত্য, গীত বা অভিনয়ে প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণ করে, তাদের সংখ্যা স্বভাবতই কম। কিন্তু তাদের শিক্ষা অধিকতর ফলপ্রসূ। নিজেদের অভিনয়, নৃত্য, গীতকে সুষ্ঠু করার আগ্রহে অংশগ্রহণকারীরা বিষয়-বস্তুকে সম্যকভাবে আয়ত্ত করার চেষ্টা করে। ফলে তারা নানা তথ্য আয়ত্ত করে ও চরিত্র অধিগত করে। চরিত্র ফুটিয়ে তোলার চেষ্টায় নানা চরিত্রের বিশিষ্টতার সঙ্গে তারা সম্যক পরিচিত হয়। মানব চরিত্র সম্বন্ধে তাদের জ্ঞান বাড়ে। কখনও কখনও দেখা যায় নিজের অংশকে সুষ্ঠু ভাবে আয়ত্ত করার জন্য নিরক্ষর অংশগ্রহণকারী ধীরে ধীরে সাক্ষরতা লাভের সফল চেষ্টা করে। সার্থক অভিনয়কারীদের আর একটি নতুন শিক্ষা আয়ত্ত হয়। কুশলী অভিনেতা বাস্তব জীবনে অপরের সঙ্গে কথা বার্তায় আলাপ আলোচনায় অধিকতর কুশলতা প্রদর্শন করে।

আনন্দানুষ্ঠান সফল করার জন্য অনুষ্ঠানকারীদের মধ্যে এক বা একাধিক ব্যক্তিকে নেতৃত্ব করতে হয়। এতে নেতৃত্বের ব্যবহারিক শিক্ষা অনুষ্ঠান পরিচালনকারীরা সহজে পায়। অনুষ্ঠানের সাফল্য নির্ভর করে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে সহযোগিতার উপর। যে কোন এক জন সহযোগিতা না করলে গোটা অনুষ্ঠানের সাফল্য বিঘ্নিত হয়। অনুষ্ঠানের পূর্ণ সাফল্য নির্ণীত হয় দুর্বলতম অংশ গ্রহণ-কারীর নৈপুণ্যের দ্বারা। কাজেই একজনও যদি দুর্বল হয় গোটা অনুষ্ঠানও দুর্বল হয়। সকল অংশ-গ্রহণকারীর মধ্যে সহযোগিতার ব্যবহারিক শিক্ষা এভাবে হয়। যোগদানকারীদের মধ্যে শৃঙ্খলা-

বোধও জাগে অনুষ্ঠানের সাফল্যের গরজে। এ ধরনের অনুষ্ঠান অংশগ্রহণকারীদের মনে আত্ম-প্রত্যয় বৃদ্ধি করে আর ব্যক্তিত্ববোধ জাগায়। এমন অনেক লোক আছে যারা জীবনের অন্য ক্ষেত্রে বিফল হয়ে নিজেদের অপদার্থ মনে করে দুঃখ পেয়েছে, তারা অভিনয় নৃত্য, গীতে তাদের কুশলতা আবিষ্কার করে আত্ম-প্রত্যয় ফিরে পেয়েছে। এ ধরণের শিক্ষা ব্যক্তিগত এবং সামাজিক জীবনে তাদের কাছে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় শিক্ষা।

নৃত্য বা ক্রীড়াদি অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণকারীদের সহযোগিতা, শৃঙ্খলাবোধ, নেতৃত্ব প্রভৃতি অভ্যাসের মাধ্যমে শিক্ষা হয়। এতে অতিরিক্ত আর একটি শিক্ষাও তাদের হয়। এতে তারা পায় শরীর চর্চার শিক্ষা। এ শিক্ষা সাধারণ শিক্ষার যেমন অপরিহার্য অংশ, সামাজিক শিক্ষারও তেমনই একটা অপরিহার্য অংশ।

মনের দিক থেকে এবং শিক্ষার দিক থেকে যাত্রা, কবি, কীর্তন, কথকতা, তর্জা, লোকনৃত্য প্রভৃতির প্রয়োজনীয়তা বা উপযোগিতা সম্বন্ধে আমাদের পূর্বপুরুষগণও আমাদেরই মত সচেতন ছিলেন। সে-জন্যই হয়ত বৎসরের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরণের অনুষ্ঠানের বিধান তাঁরা দিয়েছিলেন। এই সকল অনুষ্ঠানকে উপলক্ষ করে যাত্রা, কবি, তর্জা, কীর্তন, কথকতা, নৃত্য প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হত। তাতে লোকেরা আনন্দ এবং শিক্ষা উভয়ই পেত। নানা কারণে, বিশেষত বিদেশী শিক্ষা এবং সভ্যতার প্রভাবে, এগুলো হয়ত লোপ পাচ্ছিল বা রূপ বদলাচ্ছিল। ভারতের স্বাধীন সরকার এগুলোকে পুনরুজ্জীবিত করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। অনেক ক্ষেত্রে পুনরুজ্জীবন সম্ভবও হয়েছে।

নানা ধরনের আনন্দানুষ্ঠানের আয়োজনকারীদের কয়েকটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন। বিষয় নির্বাচনে তাদের সতর্ক থাকতে হবে। এমন বিষয় নির্বাচিত হওয়া প্রয়োজন যাতে অনুষ্ঠান যুগের এবং পরিবেশের চাহিদা মিটাতে পারে। অনুষ্ঠানের জন্য নির্দিষ্ট পরিবেশ সুস্থ এবং মনোরম হওয়া প্রয়োজন। অস্বাস্থ্যকর বা অপরিচ্ছন্ন

পরিবেশে পরিবেশিত আনন্দ বা শিক্ষা লোকেদের আকর্ষণ করতে পারে না বা লোকেদের মনের উপর বাঞ্ছিত প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। গ্রীষ্মে উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ আর বর্ষা বা শীতে বিদ্যালয় প্রভৃতির প্রশস্ত কক্ষে আনন্দানুষ্ঠানের আয়োজন করা যেতে পারে। সংকীর্ণ আলোবাতাস-হীন অন্ধকার পরিবেশ আনন্দ লাভের প্রতিকূল অবস্থা সৃষ্টি করে।

অনুষ্ঠানে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যোগদানকারীদের মন থেকে অন্তত অনুষ্ঠানের সময় ছোট বড় ভেদাভেদ জ্ঞান বিসর্জন দিতে হবে। অবশ্য এ কথার অর্থ এই নয় যে বয়ঃকনিষ্ঠ বয়োজ্যেষ্ঠকে সম্মান দেখাবে না। ছাত্র-শিক্ষক এক সঙ্গে অনুষ্ঠানে প্রত্যক্ষভাবে যোগদান করবে। কিন্তু তারা অতি প্রয়োজনীয় ব্যবধানটুকু বজায় রাখবে। তবে আনন্দানুষ্ঠানে সকল ব্যক্তির স্থান নির্ণীত হবে তাদের বিশেষ ক্ষেত্রের যোগ্যতা দিয়ে।

এ ধরনের আনন্দানুষ্ঠানে পরোক্ষ যোগদানকারীর সংখ্যা বেশী হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। প্রত্যক্ষ যোগদানকারীর সংখ্যাও যেন যথা সম্ভব বেশী হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। তবেই এক দিকে বিভিন্ন ব্যক্তি তাদের যোগ্যতা দেখাবার সুযোগ পায়, অপর দিকে অধিকতর লোকের প্রত্যক্ষ শিক্ষার সুযোগ হয়।

আমাদের দেশের মানুষ নিরানন্দময় পরিবেশে আজও বাস করছে। তাদের চার ভাগের তিন ভাগ আজও অজ্ঞতার অন্ধকারে ডুবে আছে। তাদের জীবনকে এতটুকু সুষ্ঠু, এতটুকু মধুর এতটুকু সফল করতে হলেও যে সকল ব্যবস্থার প্রয়োজন, আনন্দানুষ্ঠান যে তার অন্যতম সে কথা আমাদের স .ল সময়েই মনে রাখতে হবে।

(সতের)

লোক শিক্ষার শ্রব্যদৃশ্য সহায়ক (audio-visua

মানুষ একদিকে যেমন প'ড়ে লিখে অপর দিকে দেখে শুনেও শিখে। শিক্ষিত ব্যক্তিদের কাছে প'ড়ে শিখাটাই সহজ কাজ। অল্প আয়াসেই তারা শিক্ষা পায়। তাদের কাছে অবশ্য দেখে শুনে শিখার পথও খোলা। কিন্তু যারা লেখাপড়া জানে না, তারা কেবল দেখে শুনেই শিখতে পারে। প'ড়ে শিখার পথ তাদের কাছে রুদ্ধ। তবে দেখে শুনে যা শিখা যায় সেটার স্থায়িত্ব কেবল পড়ে যা শিখতে পারা যায় তার চাইতে সকল ক্ষেত্রেই বেশী।

আমাদের দেশে অতি অল্প লোকই লেখাপড়া জানে। কাজেই প'ড়ে শিখবার সুযোগও পাচ্ছে অতি অল্প লোক। অবশিষ্ট যারা রয়েছে তারা লিখে প'ড়ে শিখতে পারবে না, দেখে শুনেই তারা শিখবে। এমনও অনেক লোক রয়েছে যারা কোন ক্রমেই লিখতে পড়তে শিখবে না, বা যাদের লিখতে পড়তে শিখার বয়স নেই। তাদের শিখাতে হলে দেখিয়ে পড়িয়ে শিখান ছাড়া গত্যন্তর নেই।

দেখিয়ে শুনিয়ে শিখাবার যে সকল উপায় রয়েছে সেগুলোকে শিক্ষার শ্রব্যদৃশ্য সহায়ক বলা হয়। শিক্ষার শ্রব্যদৃশ্য উপায়গুলো কেবল যে বয়স্কদের শিক্ষার ক্ষেত্রে উপযোগী তা নয়, এগুলো শিশু বা কিশোরদের শিক্ষার ক্ষেত্রেও কেবল উপযোগী নয়, প্রয়োজনীয়ও। এমন অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় আছে যা কেবল শ্রব্যদৃশ্য সহায়কের সাহায্যেই সহজবোধ্য হয়ে উঠে।

আজকাল চলচ্চিত্র শ্রব্যদৃশ্য সহায়কের মধ্যে সকল রকমের শিক্ষার ক্ষেত্রেই একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে। এই সহায়কের উপযোগিতা সম্বন্ধেও সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। চলচ্চিত্র

একদিকে যেমন এক সঙ্গে বহু লোকের আনন্দবিধানে সক্ষম, অপর দিকে স্মৃতির পর্দায় একটা স্থায়ী ছাপ রেখে শিক্ষাদানেও খুব সার্থক। চলচ্চিত্র নির্মাতা যদি সযত্নে এ দুটি উদ্দেশ্যকেই সমানভাবে সফল করার চেষ্টা করে, তাহলে আনন্দ এবং আনন্দের মাধ্যমে শিক্ষাদান করে দেশের প্রভূত কল্যাণ সাধন করতে পারে। শুধু আনন্দ বিধানের জন্য যে ছবি নির্মিত হয়, সে ছবিও দর্শকদের কিছুটা শিক্ষা যে না দেয় তা নয়; তবে সে শিক্ষা অনেক সময় উপরি পাওনা বলে অনেকের কাছেই ফলবতী হয় না। আবার কেবল শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে যদি কোন চলচ্চিত্র নির্মিত হয়, তবে তা আনন্দের সঙ্গে সংস্পর্শবিহীন বলে আকর্ষণীয় হয় না। তাই নির্মাতাকে দুই উদ্দেশ্যের কথাই সমানভাবে মনে রাখতে হয়।

চলচ্চিত্রের মাধ্যমে মানুষ তাদের পাড়া প্রতিবেশীদের অধিকতর ঘনিষ্ঠভাবে জানতে পারে। তারা দেশ-বিদেশের নানা ঘটনার কথা জানতে পারে। এর সাহায্যে লোকেদের মধ্যে ইতিহাস ভূগোলের জ্ঞান পরিবেশন করা চলে। নানা বৈজ্ঞানিক উপায় বা প্রক্রিয়া লোকেদের কাছে সহজ করে বুঝিয়ে দেওয়া চলে। এর সাহায্যে কারিগরী বিদ্যাও শিক্ষাদান করা চলে। কোন কোন ক্ষেত্রে হয়ত বা একাধিক প্রদর্শনীর আয়োজন করতে হয়, যাতে একাধিকবার দেখে সাধারণ লোক সেটাকে সহজে আয়ত্ত করতে পারে। বিগত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় চলচ্চিত্রের সাহায্যে কেবল সংবাদ পরিবেশন নয়, সামরিক বিদ্যায় শিক্ষাদানও করা হয়েছে। এক সঙ্গে বহু লোককে আনন্দ এবং শিক্ষাদানে চলচ্চিত্রের উপযোগিতার কথা সর্বত্রই স্বীকৃত হচ্ছে।

চলচ্চিত্রকে লোক শিক্ষার উপযোগী করতে হলে কয়েকটি উপায় অবলম্বন করতে হয়। যে কাহিনী বা ঘটনাকে অবলম্বন করে ছবিটি তৈরী হবে, তা যেন সংশ্লিষ্ট দর্শকদের জীবন এবং জীবিকার সঙ্গে যোগ-বিহীন না হয়। যে চরিত্র ছবিতে স্থান পায় তা যেন তাদের কাছে

অপরিচিত না হয়। শিক্ষিতব্য বিষয় নিশ্চয়ই নূতন হবে, কিন্তু চরিত্র এবং পরিবেশ যথাসম্ভব পরিচিত হওয়াই প্রয়োজন।

আজকাল নির্বাক চলচ্চিত্রের প্রচলন বড় কম। সবাক চলচ্চিত্রে সঙ্গীতের একটি বিশিষ্ট স্থান থাকা প্রয়োজন। সঙ্গীত সকল লোকই ভালবাসে। এর আবেদন বিশ্বজনীন। সঙ্গীত সহজে মনের দরজায় আনন্দ এবং শিক্ষা পৌঁছে দেয়। তাই সকল চলচ্চিত্রেই সঙ্গীত সন্নিবেশের প্রয়োজন। সঙ্গীত নির্বাচনের মূল উদ্দেশ্য যেন ব্যাহত না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হয়।

ধীর গতিশীল চলচ্চিত্র পল্লী অঞ্চলের পক্ষে খুব বেশী উপযোগী। অনভ্যস্ত পল্লীবাসীরা দ্রুত গতিশীল চলচ্চিত্রের ঘটনাবলী বা দৃশ্যাবলী বা কর্মপ্রণালী সহজে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। কখনও কখনও দ্রুত গতিশীল হলে ছবি তাদের কাছে ধাঁধার সৃষ্টি করে। তাই প্রদর্শনী যিনি পরিচালন করবেন, তাকে মনে রাখতে হবে যেন প্রদর্শনীর গতি একটু ধীর হয়।

কোন একটি ছবির সাহায্যে নানা বিষয় একসঙ্গে শিক্ষা দেওয়া চলে। কিন্তু লোকশিক্ষার জন্য নির্মিত ছবিতে এ প্রচেষ্টা না থাকাই শ্রেয়। সাধারণ মানুষের পক্ষে একসঙ্গে অনেক বিষয় গ্রহণ করা এবং ধরে রাখা কঠিন। তাই লোকশিক্ষার উদ্দেশ্যে নির্মিত ছবির শিক্ষণীয় বিষয় একাধিক হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়।

শিক্ষামূলক সকল ছোট ছবিই সরস বা আকর্ষণীয় নাও হতে পারে। এধরণের ছোট শিক্ষামূলক ছবি দেখাতে হলে তার আগে সরস কোন ছবি দেখিয়ে নিতে হয়। শিক্ষামূলক আংশিক ভাবে নীরস ছবি দেখাবার পর কখনও কখনও একটু সরস বক্তৃতা বা আলোচনা বেশ উপযোগী হয়। এধরণের বক্তৃতা বা আলোচনা সব সময়ই সুফলপ্রসূ হয়। কখনও কখনও কোন বিষয়ে জনসাধারণকে অবহিত করাবার জন্য বক্তৃতার আয়োজন করতে হলে তার আগে ছবি দেখাবার ব্যবস্থা করতে হয়। এতে একদিকে যেমন লোকেদের

সহজে জমায়েত করার সুবিধা হয়, অপরদিকে লোকেদের জানবার আগ্রহকে সজাগ করাও সহজ হয়।

ছোট ছোট ছবি বা ফিল্‌মস্ট্রীপ বয়স্কশিক্ষার কাজে বড় ছবির চাইতে অধিকতর উপযোগী। কারণ প্রদর্শনীর গতি এক্ষেত্রে সহজে নিয়ন্ত্রিত করা যায়, আর সঙ্গে সঙ্গে ছবির বিষয় বুঝিয়ে বক্তৃতাও করা যায়। যোগ্য শিক্ষক এধরণের ছবি ব্যবহার করে নিজের বক্তব্য বিষয়কে শিক্ষার্থীর কাছে স্পষ্ট করতে পারেন আর শিক্ষার্থীরাও সহজে শিক্ষণীয় বিষয় আয়ত্ত করতে পারে। একাজে ম্যাজিক লণ্ঠনও বেশ উপযোগী। এর সঙ্গে বক্তৃতা প্রায় অপরিহার্য।

মানচিত্রের সাহায্যে বিভিন্ন স্থানের অবস্থান বুঝিয়ে দেওয়া খুব সহজ। বিশাল বিশ্বের কে কোথায় রয়েছে, কার সঙ্গে কার কিভাবে যোগাযোগ হচ্ছে, এসব কেবল সাধারণ নয়, শিক্ষিত লোকেদেরও সম্যক উপলব্ধি করতে হলে মানচিত্রের সাহায্য নিতে হয়। চলতি যে সংবাদ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়, তারও অনেকখানি বুঝবার জন্য মানচিত্রের সাহায্য নিতে হয়। যারা সুশিক্ষিত তাদের মানসপটে এই মানচিত্র অঙ্কিত থাকে বলে, মানচিত্রের সাহায্য তাদের না নিলেও চলে। কিন্তু অপর সকল ব্যক্তিরই মানচিত্রের সাহায্য নিতে হয়।

কি বয়স্কদের কি শিশুদের সকলের শিক্ষার ক্ষেত্রেই ব্ল্যাকবোর্ডের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। বয়স্কদের শিক্ষার প্রথম পাঠই শুরু হয় এই ব্ল্যাকবোর্ডের সাহায্যে। প্রাচীর পত্রে বা পোস্টারে বড় হরফে ছবির সাহায্যে সদ্যসাক্ষর বা অল্পশিক্ষিতদের মধ্যে নানা তথ্য পরিবেশন করা খুব সহজ হয়। সংবাদের বোর্ড বা বুলেটিন বোর্ড সদ্যসাক্ষর বা স্বল্পশিক্ষিতদের কাছে প্রতিদিনকার বাছাইকরা সংবাদের সারাংশ পরিবেশনের এক উৎকৃষ্ট সহায়ক। যেখানে জনসমাগমের সম্ভাবনা, সেখানে এমন একটি বোর্ড রাখলে সমাগত ব্যক্তিরা তা দেখে প্রতিদিনকার সংবাদ জানতে পারে।

নানা বিষয়ের তথ্য পরিবেশন করার কাজে ছবি, মডেল, বা উৎপন্ন দ্রব্যের প্রদর্শনী খুব উপযোগী। স্বাস্থ্যের নিয়ম জানাতে হলে সুন্দর রূপে সাজিয়ে রাখা ছবি এবং তার সঙ্গে বিশ্লেষণী একটু বক্তৃতা বেশ কাজ করে। কৃষি সম্বন্ধে সাধারণ লোকেদের অবহিত করাতে হলে নানা ধরণের ছবি এক নমুনার প্রদর্শনীর সঙ্গে বিশ্লেষণী ছোট বক্তৃতা খুব কার্যকরী হয়, ছবি এঁকে, বড় বড় হরফে লিখে বা তুলনামূলক রেখা টেনে বোর্ডে বা কোন বড় কাগজে রাখলে তাতেও নিরক্ষর বয়স্করা শিখবার সুযোগ পায়।

শ্রব্য উপাদানের মধ্যে সব চাইতে বেশী উপযোগী এবং জনপ্রিয় হল বেতার যন্ত্র বা রেডিয়ো, বেতারের ছুটো বিশেষ সুবিধা আছে। এর সাহায্যে দূরত্বকে সহজে জয় করা যায়। হাজার হাজার মাইল দূর থেকে এর শব্দ সমানভাবে শুনা যায়, আর রেডিয়োর সাহায্যে মানুষকে প্রায় প্রত্যক্ষ ভাবে সম্বোধন করা যায়। এর একটা অসুবিধা হলো রেডিয়ো চালিয়ে দিয়ে শ্রেণীকক্ষে তার সাহায্যে শিক্ষাদান চলে না—যেমন চলে ছোট ফিল্ম বা ম্যাজিক লণ্ঠনের সাহায্যে, তবুও বেতারের আকর্ষণী শক্তি অপূর্ব। কোন কিছু দরকারী কথা পরিবেশনের আগে লোককে একত্র করাবার কাজে এর সার্থকতা খুব বেশী।

বেতারের সাহায্যে সংবাদ প্রচার খুব অল্পকালের মধ্যে হয়, নানা ধরণের প্রয়োজনীয় ঘোষণা বেতারের মাধ্যমে চলে। স্বাস্থ্য ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত নানা তথ্য এর মাধ্যমে প্রচার করা হয়। এতে নিরক্ষর ব্যক্তিরাও জীবনের প্রয়োজনীয় বহু তথ্য জানতে পারে, তাদের শিক্ষা হয়, আনন্দদানের জন্য বেতারের মাধ্যমে সেরা গায়কদের গান এবং সেরা অভিনেতৃ বৃন্দের অভিনয় পরিবেশন করা হয়। আজকাল আমাদের বহু সমাজশিক্ষা কেন্দ্রে সমাজমিলনকেন্দ্রে রেডিয়োর ব্যবস্থা রয়েছে, সেখানে বহুলোক একসঙ্গে বসে প্রচারিত সঙ্গীত, অভিনয়, বক্তৃতা, ঘোষণা প্রভৃতি শোনে। তারপর কেন্দ্রের

ভারপ্রাপ্ত কর্মী লোকেদের সঙ্গে শ্রুত বিষয় নিয়ে আলোচনা করে। এতে এদের শিক্ষার কাজ হয়। শিক্ষার শ্রব্য উপাদানের মধ্যে গ্রামোফন রেকর্ড অন্যতম, ভাল ভাল শিক্ষণীয় বিষয় গ্রামোফন রেকর্ডের মাধ্যমে পরিবেশন করা সহজ। একজন বিশেষজ্ঞ সরলভাষায় কোন একটি বিষয় আলোচনা করলে তা যদি রেকর্ড করে রাখা হয় তবে গ্রামোফনের সাহায্যে তা যতবার ইচ্ছা বাজিয়ে লোকেদের শুনান যায়। সঙ্গীত অভিনয় প্রভৃতিও এর মাধ্যমে সহজে পরিবেশন করা যায়। এক দিক দিয়ে গ্রামোফন রেকর্ডের উপযোগিতা রেডিয়োর উপযোগিতায় চাইতে বেশী। এটা বারবার শোনান চলে, যিনি এর সাহায্যে শিক্ষাদান করেন তিনি ইচ্ছা করলে মধ্যপথেও খানিকক্ষণ বন্ধ রেখে আলোচনা করতে পারেন। আবার আলোচনার শেষে নতুন করে বাকীটুকু শোনাতে পারেন। রেডিয়োর ক্ষেত্রে এধরণের নিয়ন্ত্রণ মোটেই সম্ভব নয়। প্রত্যেক সামাজিক শিক্ষাকেন্দ্রে একটি করে গ্রামোফন থাকলে আর কয়েকটি কেন্দ্রের জন্য বেশ কিছু গ্রামোফন রেকর্ড থাকলে সেগুলো সবকটি কেন্দ্রে পালা করে চালান চলে, রেডিয়োর মতই গ্রামোফন রেকর্ডেরও একটি সুবিধা হচ্ছে এর সাহায্যে লোকেদের কোনস্থানে জমায়েত করা সহজ হয়।

ভারতের মত দেশে লোকশিক্ষার জন্য শ্রব্যদৃশ্য উপাদানের উপযোগিতা এত বেশী যে, এর জন্য দেশের সরকার বা বিভিন্ন কল্যাণকামী প্রতিষ্ঠান যত বেশী ব্যবস্থা করবে ততই দেশের কল্যাণ সাধিত হবে।

আঠার

গণমিলন কেন্দ্র—Community Centre

যেখানে কোন একটি অঞ্চলের সকল লোক বিভিন্ন সময়ে আনন্দানুষ্ঠান, খেলাধূলা, শিক্ষা ও কল্যাণমূলক কাজের জন্য সমবেত হয়, তাকেই আমরা গণমিলন কেন্দ্র বা Community Centre বলে থাকি। আগের দিনে আমাদের পল্লী অঞ্চলের জমিদারের আটচালায় কিংবা ছায়াশীতল গাছের তলায় বা এমনই কোন নির্দিষ্ট স্থানে অঞ্চলের প্রধান ব্যক্তিরা মিলিত হয়ে অঞ্চলের নানা কল্যাণমূলক কাজের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করত, আনন্দানুষ্ঠানের ব্যবস্থা করত, এমনকি অপরাধীর দণ্ডবিধানও করত। তখন এগুলোই ছিল পল্লীর প্রাণকেন্দ্র। এ থেকেই গোটা অঞ্চলময় প্রাণরস ছড়িয়ে পড়ত। ধীরে ধীরে এগুলো লোপ পেতে বসেছিল। দেশের গরজে এগুলো সরকারী বেসরকারী উভয় প্রকারের চেষ্টায় পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠেছে।

গণমিলন কেন্দ্রের জন্য পল্লীর যথাসম্ভব একটি বিস্তীর্ণ এবং মনোরম স্থান খুঁজে নেওয়া হয়। তারপর সরকারী এবং স্থানীয় লোকেদের চেষ্টায় তাতে একটি গৃহ নির্মাণ করা হয়। সঙ্গে নানা অনুষ্ঠানাদির জন্য সাধারণত চারদিক খোলা একটা হলঘর নির্মিত হয়। তারই পাশে মনোরম ছোট একটি বাগান বা পার্কের ব্যবস্থা থাকে, এবং সম্ভবমত খেলাধূলার জন্য খোলা মাঠও থাকে।

শুরুতেই বলা হয়েছে, এর কর্মসূচীতে স্থান পায় আনন্দানুষ্ঠান, খেলাধূলা, শিক্ষা, আলোচনা এবং কল্যাণমূলক কাজ। পল্লীর লোকেরা এখানে বিভিন্ন উৎসব পালন করে, সেই সঙ্গে আনন্দানুষ্ঠানের ব্যবস্থা করে। বিভিন্ন মহাপুরুষের জন্মতিথিতে বা মৃত্যুদিবসে বা পূজাপার্বনে তারা নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। সেই অনুষ্ঠানে পল্লীর আবালবৃদ্ধবনিতা কেউ বা প্রত্যক্ষভাবে কেউ বা পরোক্ষভাবে

যোগদান করে। এসকলের মধ্যদিয়ে পল্লী সজাগ হয়ে উঠে। পল্লীবাসীর শ্রান্তি ক্লান্তি দূর হয়। তারা অবসর বিনোদনের প্রকৃষ্ট উপায়ের সন্ধান পায়।

খেলাধূলা গণমিলন কেন্দ্রের কর্মসূচীর বিশিষ্ট অংশ। এতে বিভিন্ন বিভাগে শিশু থেকে বৃদ্ধরাও অংশ গ্রহণ করে। এগুলো কোন বিশেষ অনুষ্ঠান বা উৎসবের অপেক্ষা রাখে না, বরং নিত্য-নৈমিত্তিক কর্মসূচীর অঙ্গ। শিশুদের জন্য, যুবকদের জন্য, বয়স্কদের জন্য এবং মহিলাদের জন্য পৃথক ধরণের ক্রীড়ার ব্যবস্থা থাকে, পৃথক সময়ও নির্দিষ্ট থাকে। প্রত্যেক শ্রেণীর লোকেরা নিজেদের অভিরুচি অনুসারে অংশ গ্রহণ করে।

গণমিলন কেন্দ্রে পল্লীবাসীর শিক্ষারও ব্যবস্থা থাকে। এখানে নিয়মিতভাবে সামাজিক শিক্ষাকেন্দ্র পরিচালনা করা হয় সন্ধ্যায়। সকল বয়স এবং সকল রুচির লোকেরাই যেন পড়বার সুযোগ পায় তার জন্য পাঠাগারের উদার ব্যবস্থা থাকে। পাঠাগার বা সামাজিক শিক্ষাকেন্দ্র থেকে প্রাচীরপত্র, ছবি প্রভৃতির প্রদর্শনীর আয়োজন হয়। বিশেষ বিশেষ অঞ্চলের বিশেষ বিশেষ কুটির শিল্পের চর্চাও এখানে হয়। মেয়েদের সূচীশিক্ষা, সেলাই প্রভৃতিও কোন কোন গণমিলন কেন্দ্রে শিক্ষা দেওয়া হয়।

পল্লীর কল্যাণ হতে পারে এমন যে সকল কাজ আছে গণমিলন কেন্দ্রে তা সম্পাদনের উপায় নির্ধারিত হয়। পল্লীর লোকেরাই সেই সকল কাজ নিজেদের চেষ্টায় সম্পন্ন করে। রাস্তা-ঘাট নির্মাণ, জল-নিকাশ, নলকূপ স্থাপন প্রভৃতির ব্যবস্থা এই গণমিলন কেন্দ্রে হয়ে থাকে।

গণমিলন কেন্দ্র পল্লীবাসীর অবসর বিনোদনেরও সুযোগ দেয়। নানা কর্মসূচী এতে অনুসৃত হয় বলে কর্মক্লান্ত পল্লীবাসী এখানে এসে নিজ অভিরুচি অনুসারে নিজের অবসর সময় অতিবাহিত করে। কেউবা গানবাজনা করে, কেউবা বই পড়ে, কেউবা খেলাধূলা করে।

আবার কোন কোন ব্যক্তি অবসর সময়ে নিজের আয় বাড়াবার জন্য কোন ছোটখাট কুটির শিল্পের চর্চা করে।

গণমিলন কেন্দ্রের একটা বৈশিষ্ট্য হল এখানকার সকল কর্মসূচীই অনুসৃত হয় সমবেতভাবে। পরস্পরের সহযোগিতায় পল্লীবাসীরা আনন্দলাভ করে, শিক্ষালাভ করে, অবসর বিনোদন করে। এর ফলে পল্লীবাসীরা সহজভাবে একে অন্যের সাহচর্যে কাল কাটিয়ে নিজেদের ঘনিষ্ঠতাকে দৃঢ় করার সুযোগ পায়। এতে তারা স্বার্থপরতার ক্ষুদ্র গণ্ডী থেকে বেরিয়ে এসে অপরের কথা ভাবতে শিখে।

গণমিলন কেন্দ্রের কাজ চালাবার জন্য সাধারণতঃ একজন পরিচালক থাকে এবং তাকে সাহায্য করার জন্য গ্রন্থাগারে থাকে একজন গ্রন্থাগারিক আর বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রে থাকে একজন বয়স্ক শিক্ষার শিক্ষক। তাছাড়া নানা ছোটখাট বৃত্তি শিখাবার জন্যও সেই সেই বৃত্তিতে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন লোক থাকে। এদের মধ্যে কেউ বা পারিশ্রমিক পেয়ে থাকে, কেউ বা বিনা পারিশ্রমিকেই কাজ করে। একথা মনে রাখা দরকার যে এরাই কিন্তু গণমিলন কেন্দ্রের সব নয়। উৎসাহশীল পল্লীবাসীরাই গণমিলন কেন্দ্রের আসল উপাদান। তাদের সচেতনতা এবং তাদের সক্রিয়তাই হচ্ছে গণমিলন কেন্দ্রের আসল সম্পদ। বেশ বড় একটা বাড়ী, সংলগ্ন বাগান পার্ক বা কর্মীরা গণমিলন কেন্দ্রের বাইরের শোভাবর্ধন করে, কিন্তু এর অভ্যন্তরের শোভা বর্ধন করে সক্রিয় এবং সজাগ পল্লীবাসী। এ ধরণের গণমিলন কেন্দ্র আমাদের পশ্চিমবঙ্গে যে গুলো গড়ে উঠেছে সেগুলোর সংখ্যা কম। আরও এমনতর অনেক গণমিলন কেন্দ্র গড়ে ওঠা প্রয়োজন। গড়ে উঠছেনা, তার কারণ হল পল্লী বা শহর অঞ্চলে স্থানের অভাব আর অর্থের অভাব। এ সমস্যার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার একটি উপায় হল, বিদ্যালয়গুলোকে আংশিকভাবে গণমিলন কেন্দ্রে পরিণত করা। বাস্তবিক পক্ষে এধরণের গণমিলন কেন্দ্রও গড়ে উঠেছে কতকগুলি। পল্লীর বিদ্যালয়গুলোতে মোটামুটি স্থানের অভাব নেই। নতুন করে বাড়ী তৈরি করার জন্য

অর্থেরও প্রয়োজন হয় না। মধ্যাহ্নে বিদ্যালয়ের নিয়মিত কাজ চলেছে চলুক। সকাল, বিকাল, সন্ধ্যায় বিদ্যালয়ের গৃহ এবং সংলগ্ন মাঠ পল্লীর সকল অধিবাসীর কাছেই উন্মুক্ত থাকতে পারে। বাস্তবিক পক্ষে কোন কোন বিদ্যালয়কে আনুষ্ঠানিকভাবে গণমিলন কেন্দ্র বলে স্বীকার করে নেবার আগেই সেগুলো আংশিক ভাবে গণমিলন কেন্দ্রই ছিল। গ্রামের লোকেরা চিঠি লেখাতে, চিঠি পড়াতে বিদ্যালয়ের সময় বিদ্যালয়ে শিক্ষক মশাইএর নিকট এসে থাকে। বিকেলে গ্রামের যুবকরা ছাত্রদের সঙ্গে বা পাশে খেলাধুলা করে। সন্ধ্যায় কর্মক্লান্ত লোকেরা সেখানে এসে অন্ততঃ গল্পগুজব করে কাল কাটায়। এই সকল ব্যবস্থাকেই একটু সুসংস্কৃত, পরিমার্জিত এবং পরিবর্ধিত করে নিলে প্রত্যেকটি বিদ্যালয়ই একটি গণমিলন কেন্দ্রে পরিণত হয়।

এতে যে কেবল অর্থ এবং স্থানের সমস্যার সমাধান হয় তা নয়। একটা অতিবড় উদ্দেশ্য এতে সফল হয়। পল্লীর বিদ্যালয়গুলো ধীরে ধীরে পল্লীর সঙ্গে যোগসূত্র হারিয়ে ফেলছিল। ফলে পল্লীবাসীরা কেবল যে বিদ্যালয়ের কাজে ঔদাসীন্য দেখাচ্ছিল তা নয়, কোন কোন কেন্দ্রে তারা বিদ্যালয়ের প্রতি বৈরিতা পোষণ করছিল। তাতে শিক্ষার কাজে একটা মস্ত বড় বাধার সৃষ্টি হচ্ছিল। শিক্ষার কাজকে সার্থক করতে হলে গৃহের সঙ্গে বিদ্যালয়ের যোগাযোগ খুব ঘনিষ্ঠ করতে হবে। পল্লীবাসীর বৈরীভাব ত নয়ই, ঔদাসীন্যও যেন না থাকে তা দেখতে হবে। বিদ্যালয়ের নানা অনুষ্ঠানে-উৎসবে পল্লীবাসীকে কেবল ডেকে আনবে তা নয়, তাদের সক্রিয় সাহায্যও নিতে হবে। পল্লীবাসীর উৎসব অনুষ্ঠানেও বিদ্যালয়কে যোগদান করতে হবে। বিদ্যালয়েই যথাসম্ভব সেগুলো সম্পন্ন হবে। অবশ্য সেখানে সকল সময়ই সমষ্টিকে ব্যক্তির ঊর্ধ্বে স্থান দিতে হবে।

প্রত্যেকটি বিদ্যালয় যখন আনুষ্ঠানিক ভাবে গণমিলন কেন্দ্র বলে পরিগণিত হবে, তখন বিদ্যালয়ের গ্রীষ্ম বা পূজাবকাশের সময় পল্লীবাসীরা প্রয়োজন মত বিদ্যালয়েই নানা ধরণের শিক্ষার জন্য

শিবির স্থাপন করতে পারবে, প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করতে পারবে। এতে নতুন করে তারা শিখতে পারবে। তাছাড়া পল্লীবাসীরা বিদ্যালয়গুলো যে তাদের নিজেদের সেটা উপলব্ধি করবে এবং তার সর্ববিধ কল্যাণসাধনের চেষ্টা করবে। বিদ্যালয়ের গৃহ-সংস্কার প্রভৃতি নানা সমস্যারও সহজ সমাধান হবে।

সামাজিক শিক্ষার একটি উপায় হল সংঘবদ্ধভাবে জীবন যাপনের মাধ্যমে শিক্ষা। জীবন যাপনের নানা কাজের জন্য সমবেত ভাবে কাজ করার অভ্যাস গঠনের উপায় হিসাবে গণমিলন কেন্দ্রের উপযোগিতা অনস্বীকার্য। এখানে মানুষ যে ধরণের সামাজিক শিক্ষা পায়, তা ব্যবহারিক শিক্ষা। এখানে অভ্যাস গঠিত হয়। সে অভ্যাস ধীরে ধীরে মানুষের সর্বকর্মে প্রযুক্ত হয়। ফলে মানুষ জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে সমাজ জীবন যাপনের যোগ্যতা অর্জন করে।

উনিশ

পশ্চিমবঙ্গে সমাজ শিক্ষা ব্যবস্থা

বিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছে। নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা প্রণালীর উপর প্রত্যক্ষ প্রভাব বিস্তার করছে। মানুষকে বাধ্য হয়ে নতুন আবিষ্কারের কিছু না কিছু খবর রাখতে হচ্ছে। উৎপাদনের নব নব উপায় উদ্ভাবিত হচ্ছে। কলকারখানার শ্রমিকদের সেই সকল নতুন উপায়ের সঙ্গে পরিচিত হতে হচ্ছে। মানুষের অবসর একটু বৃদ্ধি পেয়েছে। এই অবসর সময় কাটাবার সুষ্ঠু উপায় মানুষকে নির্ধারণ করতে হচ্ছে। কাজেই বয়স্কদের অধিকতর শিক্ষা লাভের গরজ বেড়ে চলেছে। সৌভাগ্যবশতঃ জনসংযোগের উপায়গুলো সংখ্যায় এবং নিপুণতায় অনেক বেড়েছে। এই শতাব্দীতে তাই সমাজ শিক্ষার গরজ যেমন বেড়েছে উপায়ও বৃদ্ধি পেয়েছে। সমাজ শিক্ষা স্বভাবতই মানুষের মনকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছে।

আমাদের দেশের সাধারণ লোকেদেরও অতি প্রয়োজনীয় নতুন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার বা উৎপাদন প্রণালীর সঙ্গে পরিচিত হতে হবে। অবসর বিনোদনের নতুন নতুন উপায় নির্ধারণ করতে হবে। তথাপি যদি একথা বলা হয় যে শুধু এসকল কারণেই আমাদের দেশে সমাজ শিক্ষা গুরুত্ব লাভ করেছে, তাহলে সত্যের খানিকটা অপলাপ করা হবে। ভারত স্বাধীন হবার পর ভারতে পুরাদস্তুর গণতন্ত্র প্রবর্তিত হয়েছে। এ ব্যবস্থায় জনগণের কল্যাণে জনগণ শাসনকার্য পরিচালনা করে। জনগণের দায়িত্ব খুব বেড়ে যায়। নিজেদের কল্যাণ কি তা তাদের নির্ধারণ করতে হয়। শুধু তাই নয় সেই কল্যাণ বিধানের উপায় তাদের অবলম্বন করতে হয়। নিরক্ষর অজ্ঞ লোকের পক্ষে তা সম্ভব নয়। অথচ জনসংখ্যার পাঁচ ভাগের চার ভাগই তখন নিরক্ষর আ

অজ্ঞ। সফলভাবে গণতান্ত্রিক শাসন চালাতে হলে এই নিরক্ষরতা আর অজ্ঞতার হাত থেকে আগে লোকেদের মুক্তি দিতে হবে। শাসনের মালিকদের শিক্ষা দিতে হবে। এই শিক্ষাদানের জরুরী প্রয়োজনই আমাদের দেশের সমাজশিক্ষার আগ্রহকে সতেজ করেছে। আমাদের সমাজ শিক্ষা ব্যবস্থায় অন্য প্রয়োজন মিটাবার চেষ্টা প্রতিফলিত হয়েছে। তবে বেশী করে প্রথমদিকে প্রতিফলিত হয়েছে এই নিরক্ষরতা এবং অজ্ঞতা দূর করার চেষ্টা। জ্ঞান-বিজ্ঞানের সহজ জ্ঞাতব্য অতি প্রয়োজনীয় নব নব তথ্য পরিবেশনের ব্যবস্থা এতে থাকা স্বাভাবিক। তবে নিরক্ষরতা এবং অজ্ঞতা দূরীকরণের চেষ্টা এতে থাকা অপরিহার্য।

ভারতের অন্যান্য রাজ্যের মত পশ্চিমবঙ্গেও বয়স্ক শিক্ষার কাজ ভারতের স্বাধীনতা লাভের আগেও কিছুটা হয়েছিল। তখন তাতে অধিকতর শিক্ষার কোন কর্মসূচী ছিল না। নিরক্ষরতা দূরীকরণই ছিল এর একমাত্র কর্মসূচী। স্বাধীনতার পর বিশেষ করে নতুন গরজ মিটাবার জন্য দেশের সরকার বয়স্ক শিক্ষার কর্মসূচী নতুন করে গ্রহণ করল উনিশশ' উনপঞ্চাশ সালে। সে বছর পশ্চিমবঙ্গে পাঁচশ' বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন করা হলো। তার পর ধীরে ধীরে যাত্রা, কবি, তর্জা, কীর্তন প্রভৃতি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের জন্য সাহায্যের ব্যবস্থা হলো। গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে তোলা হ'লো। গণমিলন কেন্দ্র স্থাপন করা হলো। শিক্ষাশিবির, প্রদর্শনী প্রভৃতির আয়োজন হলো। তার পর বয়স্কদের জন্য মাধ্যমিক শিক্ষার অনুরূপ শিক্ষারও ব্যবস্থা হলো।

এখানে বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রই হলো সমাজ শিক্ষার প্রধান মাধ্যম। নিরক্ষর বয়স্ক ব্যক্তিদের সাক্ষর করে তোলার দায়িত্ব বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রের। এখানে শিক্ষার্থীদের নাগরিক কর্তব্য এবং দায়িত্ব সম্বন্ধে, স্বাস্থ্য বিধি সম্বন্ধে, নিজেদের আর্থিক উন্নতি বিধানের উপায় সম্বন্ধে নানা ভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়। নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে

শিক্ষার্থীরা নিজেরা আনন্দলাভ করে এবং অপরকে আনন্দ দিবার চেষ্টা করে।

পশ্চিমবঙ্গে সরকার পরিচালিত কতগুলো কেন্দ্র আছে যেগুলোতে একজন করে শিক্ষক আছেন। এসকল কেন্দ্রে আক্ষরিক শিক্ষার উপর জোর দেওয়া হয়। অনেকগুলো কেন্দ্রে দু'জন করে শিক্ষক আছেন। এখানে সমাজশিক্ষা কেন্দ্রের সর্ববিধ কর্মসূচীই অনুসৃত হয়। আবার বেসরকারী কতগুলো কেন্দ্র আছে যেগুলো পরিচালনের জন্য সরকারী সাহায্য দেওয়া হয়। বিগত উনিশশ' একষট্টি বাষট্টি সালে এই সকল বিভিন্ন ধরণের কেন্দ্রের মোট সংখ্যা ছিল প্রায় সাড়ে-চার হাজার। আর এগুলোতে যোগদান করেছে প্রায় তিন লক্ষ লোক। এদের মধ্যে চৌরাশি হাজার লোক এই কেন্দ্রে শিক্ষা লাভ করে সাক্ষর হয়ে উঠেছে।

সদ্যসাক্ষর বা স্বল্পশিক্ষিতরা যাতে পাঠানুশীলনের সাহায্যে অর্জিত বিদ্যাকে কায়েম করতে পারে সেজন্য একটি সুষ্ঠু গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে। অনুরূপ সুষ্ঠু ব্যবস্থা বোধহয় ভারতের অন্য কোন রাজ্যে এখনও গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি। বর্তমানে সমগ্র রাজ্যের জন্য একটি রাজ্যকেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার আছে। প্রত্যেক জেলার জন্য একটি করে জেলাগ্রন্থাগার আছে। অবশ্য বর্ধমান এবং মেদিনীপুরের জন্য দুটি করে চারটি এবং চব্বিশপরগণার জন্য তিনটি জেলাগ্রন্থাগার রয়েছে। প্রত্যেকটি থানা বা তদনুরূপ অঞ্চলের জন্য একটি করে পল্লীগ্রন্থাগার বা Rural Library রয়েছে। এগুলোর মোট সংখ্যা এখন হল পাঁচশ' চার। তাছাড়া পল্লী অঞ্চলে রয়েছে ছোট বড় নানা ধরণের গ্রন্থাগার যেগুলোকে সরকারী সাহায্য দেওয়া হয়।

সম্প্রতি দশটি মহকুমা সহরে দশটি মহকুমা গ্রন্থাগার এবং দশটি পৌর অঞ্চলে দশটি পৌর গ্রন্থাগার স্থাপন করা হয়েছে।

আর এক ধরণের গ্রন্থাগার রয়েছে যাকে বলা হয় আঞ্চলিক গ্রন্থাগার। প্রত্যেকটি আঞ্চলিক গ্রন্থাগারের সঙ্গে পাঁচটি করে রয়েছে

সহযোগী গ্রন্থাগার। এ ছাড়াও ছু'টি পৃথক অঞ্চলে ছু'টি কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার রয়েছে। সদ্যসাক্ষরদের বা স্বল্পশিক্ষিতদের পড়ার উপযোগী বই সব গ্রন্থাগারেই রাখা হয়।

যাত্রা, কবি, তর্জা, কীর্তন, কথকতা প্রভৃতির মাধ্যমে জনশিক্ষার ব্যবস্থাকে সঞ্জীবিত করে চালু রাখারও যথাসম্ভব ব্যবস্থা করা হয়েছে ও তদনুসারে কাজ চলছে। এধরণের অনুষ্ঠানের জন্য সরকারী সাহায্য দেওয়া হয়। উনিশশ' একষট্টি বাষট্টি সালে এধরণের প্রায় আঠারশ' অনুষ্ঠানের জন্য উনচল্লিশ হাজার টাকা সাহায্য দেওয়া হয়েছিল এবং এগুলোতে প্রায় আটলক্ষ লোক যোগদান ক'রে আনন্দ এবং শিক্ষালাভ করেছে। প্রায় ছু' হাজার চলচ্চিত্র প্রদর্শনীতে ছয় লক্ষের অধিক লোক যোগদান করেছে।

কথকতা, কীর্তন প্রভৃতি কলায় শিক্ষাদানের জন্য তিনটি বিশেষ প্রতিষ্ঠানকে সরকারী সাহায্য দেওয়া হয়। দক্ষ এবং অভিজ্ঞ শিল্পীরা এই সকল প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের কথকতা এবং কীর্তন শিক্ষা দেন। এর ফলে এই সকল দক্ষ শিল্পীর অবর্তমানেও শিল্প নষ্ট হয়ে যাবার আশঙ্কা হ্রাস পাবে।

ঐ বছরে পশ্চিমবঙ্গে বারটি গণমিলন কেন্দ্রে (Community centre) এবং উনষাটটি বিদ্যালয়-বনাম-গণমিলন কেন্দ্রে (school-cum-community centre) পঞ্চাশ হাজারের অধিক লোক যোগদান ক'রে এর বিভিন্ন কর্মসূচীতে অংশ গ্রহণ করেছে এবং তারই মাধ্যমে শিক্ষালাভ করেছে।

অনেক বয়স্ক মাধ্যমিক শিক্ষা লাভ ক'রে নিজের শিক্ষাগত যোগ্যতা বাড়াতে চায়। তাদের জন্য সম্প্রতি কুড়িটি বয়স্ক বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। এতেও প্রায় তিন হাজার বয়স্ক ছাত্রছাত্রী মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষালাভ করছে।

সামাজিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার উপর যথাযথভাবে আলোক সম্পাত করার উদ্দেশ্যে প্রতিবৎসর একটি দিনে (সাধারণত ১লা

ডিসেম্বর) দেশে সমাজশিক্ষা দিবস পালন করা হয়। এই দিনে আলোচনা, প্রদর্শনী, সভা, সমিতি ও আনন্দানুষ্ঠানের মাধ্যমে জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। যথাযথ প্রচারের অভাবে আমাদের দেশের সমাজশিক্ষা ব্যবস্থা যে অসুবিধার সম্মুখীন হয় সে অসুবিধা এইদিনের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কিছুটা দূরীভূত হয়। এই দিনে বহুলোক নিরক্ষরতা দূরীকরণের শপথ গ্রহণ করে।

পশ্চিমবঙ্গে সমাজ শিক্ষার দায়িত্ব সরকারের দুটি বিভাগের উপর ন্যস্ত আছে। একটি হল শিক্ষাবিভাগ, অপরটি হল উন্নয়ন বিভাগ। এই দুটি বিভাগ পূর্ণ সহযোগিতার সহিত কাজ করে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সকল বিশেষজ্ঞরাই মনে করেন যে এ দায়িত্ব যে কোন এক বিভাগের উপর ন্যস্ত করাই সঙ্গত। তাতে সাফল্য বা অসাফল্যের জন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগকে দায়ী করা যায়।

সমাজ শিক্ষা পরিকল্পনাকে রূপ দেবার জন্য শিক্ষা বিভাগের একটি বিশেষ শাখা রয়েছে। সে শাখার নাম সামাজিক শিক্ষা শাখা। শিক্ষা অধিকর্তার অধীনে সমাজশিক্ষার প্রধান পরিদর্শক হলেন এই শাখার সর্বোচ্চ কর্মচারী। তাঁকে তাঁর কাজে সাহায্য করার জন্য রয়েছেন একজন উপপ্রধান পরিদর্শক। এঁরা গোটা পশ্চিমবঙ্গের সমাজশিক্ষা ব্যবস্থা কার্যকরী করার জন্য দায়ী। প্রত্যেক জেলায় একজন করে রয়েছেন জেলা-সমাজশিক্ষা-প্রাধিকারিক। বড় তিনটি জেলায় সমাজশিক্ষা প্রাধিকারিককে সহায়তা করছেন একজন করে অতিরিক্ত সমাজশিক্ষা প্রাধিকারিক। সমাজশিক্ষা পরিকল্পনার রূপায়ণের জন্য জেলায় দায়ী এই সমাজশিক্ষা প্রাধিকারিক। আটটি জেলায় এদের সাহায্য করার জন্য আটজন মণ্ডল সহকারী রয়েছেন। প্রত্যেকটি উন্নয়ন সংস্থায় সামাজিক শিক্ষার কাজ দেখার জন্য একজন করে সমাজশিক্ষা সংগঠক এবং একজন করে মুখ্য সেবিকা রয়েছেন। এঁরা সমাজশিক্ষার কাজ ছাড়াও সংশ্লিষ্ট অন্য কাজে উন্নয়ন সংস্থা কর্তৃপক্ষকে সাহায্য করে থাকেন। এঁরা শিক্ষা

বিভাগের কাজ করে থাকেন, অথচ এঁদের উপর স্থানীয় কর্তৃত্ব রয়েছে উন্নয়ন বিভাগের। এতে এঁদের কাজের কখনও কখনও অসুবিধা যে সৃষ্টি না হয় তা নয়। অবশ্য উন্নয়াধিকারিক যদি উদার মনোভাবাপন্ন হন, তবে এ অসুবিধা কখনও মারাত্মক হয় না।

বয়স্কশিক্ষা বা সমাজ-শিক্ষার কাজ বর্তমান পরিস্থিতিতে খুব গুরুত্বপূর্ণ। আর কাজের পরিধিও বিশাল! এই বিশালতার অনুরূপ যে পরিচালন ব্যবস্থা গড়ে তোলা দরকার তা এখনও গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি। একথা মনে রাখা প্রয়োজন যে সমাজ-শিক্ষা পরিকল্পনাকে কার্যকরী করতে হলে ব্যবস্থা আরও উদার করতেই হবে।

কুড়ি

ইংলণ্ডের বয়স্ক শিক্ষা ব্যবস্থা

ইংলণ্ডে বয়স্ক শিক্ষার ব্যাপক ব্যবস্থা রয়েছে। সে দেশের বয়স্ক-শিক্ষা ব্যবস্থায় নিরক্ষরকে সাক্ষরীকরণের কোন প্রয়োজন নেই। বয়স্ক-শিক্ষা সেদেশে অধিকতর শিক্ষা, কৃষ্টিমূলক শিক্ষা, অবসর বিনোদনের শিক্ষা আর কারিগরী শিক্ষা। সান্ধ্য বিদ্যালয়ে, অবকাশ বিদ্যালয়ে (Vacation Schools), এধরণের শিক্ষার ব্যবস্থা হয়। এর জন্য স্বল্পকালীন শিক্ষা, পত্রাবলীর মাধ্যমে শিক্ষা প্রভৃতির ব্যবস্থা রয়েছে। ইংরেজদের জাতীয় চরিত্রের বৈচিত্র্য বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয়ের মধ্যে প্রতিফলিত হয়। শ্রমিকদের শিক্ষা-সংস্থা (Workers' Educational Association) ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেণী বহির্ভূত শিক্ষাবিভাগ (Extra-mural Departments) বয়স্ক শিক্ষার অনেকখানি দায়িত্ব নিয়েছে। আর স্থানীয় শিক্ষা-কর্তৃপক্ষ (Local Education Authorities) অনেকগুলো সান্ধ্যবিদ্যালয়ের ব্যবস্থা করেছে। ইংলণ্ড এবং ওয়েল্‌স্‌এ বিশ লক্ষেরও অধিক বয়স্ক নানাধরণের সান্ধ্য বিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করছে। বিভিন্ন ক্লাব বা স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ব্যাপক ভাবে বয়স্ক-শিক্ষার ব্যবস্থা করেছে। এর জন্য কেন্দ্রীয় সরকার বা স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য দান করছে। বয়স্ক-শিক্ষার জন্য সন্ধ্যায় দিবা-বিদ্যালয়ের গৃহ ব্যবহৃত হয়। কোথাও কোথাও অন্য ধরণের উপযোগী গৃহও ব্যবহৃত হয়। সাধারণত এখানে বয়স্ক-শিক্ষার জন্য ছাত্রদের সামান্য বেতন দিতে হয়। আমাদের দেশে বিনা বেতনে বয়স্ক-শিক্ষার ব্যবস্থা করলেও ছাত্রের অভাব হয়। আর ইংলণ্ডে সামান্য বেতনের ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও শিক্ষার্থীর খুব ভীড়।

ইংলণ্ডের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যে একস্ট্রা মুরাল বিভাগ রয়েছে

তা শ্রমিকদের শিক্ষাসংস্থা, স্থানীয় শিক্ষা-কর্তৃপক্ষ প্রভৃতির সহযোগিতায় বিভিন্ন কেন্দ্রে নানাপ্রয়োজনীয় এবং উপযোগী বিষয়ে বক্তৃতার ব্যবস্থা করে। যারা নিয়মিতভাবে এসকল বক্তৃতা শ্রবণ করে নির্দিষ্ট সময়ের পর তাদের প্রশংসাপত্র বা ডিপ্লোমা দানের ব্যবস্থা আছে। বিশ্ববিদ্যালয় এবং শ্রমিকদের শিক্ষাসংস্থা এক ধরণের টিউটোরিয়েল ক্লাশের ব্যবস্থা করে, যাতে বয়স্করা বিশেষ ভাবে শিক্ষালাভ করতে পারে। এগুলোতে বয়স্ক ব্যক্তিরা পরপর তিনটি শীতকালে প্রত্যেকবার অন্ততঃ চব্বিশটি করে আলোচনায় যোগদান করে একজন শিক্ষকের অধীনে লেখার এবং পড়ার কাজ করে। প্রত্যেক শিক্ষকের অধীনে অল্পকয়েকজন করে শিক্ষার্থী থাকে। শিক্ষার্থীরা কোন বিষয়ে এবং কার অধীনে লেখাপড়া করবে তারা নিজেরাই বাছাই করে নেয়।

বয়স্কদের জন্য ইংলণ্ড এবং ওয়েল্‌সএ পাঁচটি এবং স্কটল্যাণ্ডে একটি আবাসিক কলেজ আছে। এগুলোতে এক থেকে দু'বছর পর্যন্ত বয়স্করা পড়াশুনা করে। এগুলো দেশের শিক্ষা-বিভাগ থেকে সরাসরিভাবে সাহায্য পায়। আবার উনত্রিশটি আবাসিক কলেজ রয়েছে যাতে বয়স্করা কয়েকদিন থেকে কয়েক সপ্তাহ পর্যন্ত লেখাপড়া করে। এ সকল কলেজ সাধারণত স্থানীয় শিক্ষা-কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে সাহায্য পায়।

উনিশ শ চুয়াল্লিশ সালের শিক্ষা আইনে একধরণের কাউন্টি কলেজ স্থাপনের বিধান ছিল। ইংলণ্ড এবং ওয়েল্‌সএর যে সকল ছাত্রছাত্রী আঠার বছর বয়সের আগেই বিদ্যালয়ের পড়াশুনায় ইস্তফা দেবে তারা তাদের আঠার বছর বয়স উত্তীর্ণ হবার পূর্ব পর্যন্ত বছরে অন্ততঃ চুয়াল্লিশ দিন করে এই কাউন্টি কলেজে শিক্ষা লাভ করবে, এই ছিল বিধান। এই বিধানকে এখনও কার্যকরী করা হয়নি। তবে স্বেচ্ছাসেবী কয়েকটি প্রতিষ্ঠান নিজ ব্যয়ে এধরণের কয়েকটি কলেজ স্থাপন করেছে এবং পরিচালনা করছে। এই কাউন্টি কলেজগুলো অধিকতর শিক্ষার

কলেজগুলোর পার্শ্বেই অবস্থিত হবে। এই অধিকতর শিক্ষার কলেজ-গুলো আঠার বছরের কম বয়সের শিক্ষার্থীদের জন্য পুরা সময়ের কারিগরী শিক্ষার এবং সকাল সন্ধ্যায় আংশিক সময়ের সাধারণ শিক্ষার ব্যবস্থা করবে।

ইংলণ্ডে স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানগুলো বয়স্ক-শিক্ষার কাজে বেশ একটা বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করে। ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব অ্যাডাল্ট এডুকেশন নামক প্রতিষ্ঠান বয়স্ক-শিক্ষা সংক্রান্ত নানা ধরণের গবেষণার কাজ করে। সংশ্লিষ্ট বয়স্ক-শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে বয়স্ক-শিক্ষা সংক্রান্ত নানা সংবাদ বণ্টন করে এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনে সহায়তা করে। এই প্রতিষ্ঠান তার কাজের জন্য শিক্ষা মন্ত্রকের নিকট থেকে সাহায্য পেয়ে থাকে। স্কটল্যাণ্ডের জন্যও এই ধরণের একটি প্রতিষ্ঠান আছে।

শ্রমিকদের শিক্ষা-সংস্থা বয়স্ক-শিক্ষার যেসকল কাজ করে সে সকল কাজের জন্য তারা উদারভাবে সাহায্য পেয়ে থাকে গ্রেট-ব্রিটেনের কার্ণেগি ট্রাস্ট থেকে। এই ট্রাস্ট গ্রন্থাগারের সুযোগ সুবিধাদানের এবং গ্রন্থসরবরাহের দিকে বিশেষ নজর দেয় এবং সেজন্য প্রচুর অর্থের ব্যবস্থা করে।

লোকেরা যাতে চিত্রাঙ্কন প্রভৃতি চারুকলার অনুশীলন করতে বা তার রস গ্রহণ করতে পারে, তারই জন্য বিভিন্ন আর্ট গ্যালারি, পাবলিক লাইব্রেরী প্রভৃতিকে গ্রেটব্রিটেনের আর্ট কাউনসিল অর্থ সাহায্য করে থাকে। এই অর্থ-সাহায্য-পুষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে লোকেরা অবসর সময়ে গিয়ে নিজ নিজ অভিরুচি অনুসারে চারুকলার চর্চা করতে পারে এবং তা দেখে মুল্য নিরূপণ করতে শিখে। এটাও পক্ষান্তরে জীবনভর শিক্ষার বা অধিকতর শিক্ষার অন্যতম উপায়।

শিক্ষা মন্ত্রকের অর্থসাহায্যে স্থানীয় শিক্ষা-কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন অঞ্চলে গণমিলন কেন্দ্র এবং প্রদর্শনী গৃহ নির্মান করে। এখানে স্ত্রী-পুরুষ সামাজিক বা সাধারণ শিক্ষা লাভের জন্য, আনন্দলাভের জন্য এবং

অবসর বিনোদনের জন্য মিলিত হয়। এগুলো স্থাপন, পরিচালন এবং এগুলোকে সাহায্য করার নিয়ম একটি বিশেষ আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। গণমিলন কেন্দ্রগুলো পরিচালিত হয় সাধারণত কম্যুনিটি অ্যাসোসিয়েসনগুলোর দ্বারা। আর 'হল' বা প্রদর্শনী গৃহগুলো পরিচালিত হয় বিভিন্ন অঞ্চলের গ্রাম সমিতির দ্বারা। এই গণমিলন কেন্দ্র এবং প্রদর্শনী-গৃহের মাধ্যমে জনসাধারণ তাদের সাংস্কৃতিক জীবনের রস আস্বাদন করে এবং অবসর বিনোদন করে।

বয়স্ক-শিক্ষার অঙ্গ হিসাবে এক ধরণের গ্রাম্য কলেজ (Village College) স্থাপন করা হয়েছে। এগুলো এক দিক দিয়ে যুবক এবং বয়স্কদের জন্য গণমিলন কেন্দ্রের সামিল। এতে যার যার অভিরুচি অনুসারে যুবক-যুবতী বা প্রৌঢ়-প্রৌঢ়া অধিকতর শিক্ষালাভের সুযোগ পায়। অপর দিক দিয়ে প্রচলিত ধারায় শিক্ষাদানের জন্য এতে একটা ক'রে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ও থাকে। উনিশ শ' আটাশ সালে এধরণের প্রথম গ্রাম্য কলেজ স্থাপন করা হয়। এখন এগুলোর সংখ্যা হল নয়।

ইংলণ্ডের যুব-কল্যাণ-ব্যবস্থা (Youth service) পরোক্ষে বয়স্ক শিক্ষার কাজ করে। যে সকল যুবসংস্থার মাধ্যমে যুব-কল্যাণের কাজ চলে সে সকল সংস্থা যুবকদের অবসর সময়ে আনন্দদায়ক এবং শিক্ষামূলক কাজের সুযোগ দিয়ে থাকে। যুবসংস্থা পরিচালিত কোন কোন প্রতিষ্ঠান দেশের প্রচলিত নিয়মে সাধারণ শিক্ষাদানের ব্যবস্থাও করে। যুবকরা এ সকল প্রতিষ্ঠানের নানা কাজে অংশ গ্রহণ ক'রে নিজ নিজ অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশসাধনের সুযোগ পায় এবং তাতে ক'রে তারা সভ্য-সমাজের যোগ্য নাগরিক হয়ে উঠার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ শিক্ষালাভ করে। যুবকদের জন্য বিভিন্ন ধরণের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান রয়েছে। যোগদানের কোন বাধ্যবাধকতা নেই। তাসত্ত্বেও ধরণ বিচিত্র বলে কোন যুবক এটায় কোন যুবক সেটায় যোগদান করেই থাকে। তার মাধ্যমে তাদের আত্মশক্তি বিকশিত করে দেশের যোগ্য নাগরিক হবার সুযোগ তারা পায়।

সুশৃঙ্খল ভাবে যুব কল্যাণের কাজ ইংলণ্ডে শুরু হয়েছে প্রায় একশ' বছর আগে। স্বেচ্ছাসেবী সংঘগুলোই এই কাজের দায়িত্ব নিয়েছিল। বিভিন্ন সংঘের সভ্যসংখ্যা এখন ত্রিশ লক্ষের উপর। এই সভ্যদের বয়স সাধারণত একুশ বছরের কম। বড় বড় প্রতিষ্ঠান-গুলোর মধ্যে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে যোগসূত্র স্থাপন করার জন্য একটি কেন্দ্রীয় সংস্থা আছে। এই কেন্দ্রীয় সংস্থা বিভিন্ন দেশের যুব-কল্যাণ-সংস্থাগুলোর সঙ্গেও যোগাযোগ স্থাপন করে। যুব-কল্যাণ-সংস্থাগুলো শিক্ষা মন্ত্রকের কাছ থেকে সাহায্য পায়। বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা থেকেও এগুলো প্রভূত পরিমাণে সাহায্য পায়। মোদ্দা কথা, প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে যুবক-যুবতী নিজেরা যেমন সজাগ, দেশের বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান এবং সরকারও তেমনি সজাগ।

অপরাপর উন্নত গণতন্ত্রগুলো মানুষের জীবনভর শিক্ষার যে দায়িত্ব স্বীকার করে নিয়েছে, গণতন্ত্রের পথিকৃৎ ইংলণ্ড সে দায়িত্ব দীর্ঘকাল ধরেই পালন করে এসেছে। ইংলণ্ডে বিচিত্র ব্যবস্থার মাধ্যমে সকল বয়সের সকল রুচির লোকেরা শিক্ষার সুযোগ পায়। তবে অন্য কোন কোন দেশের মত এদেশের বয়স্ক-শিক্ষা কোন বিশেষ নিপুণতা অর্জনের শিক্ষা নয়। এতে কারিগরী শিক্ষারও ব্যবস্থা যে নেই তা নয়। আছে বটে, কিন্তু তার উপর কোন বিশেষ গুরুত্ব আরোপিত হয় না। ব্যবস্থার বৈচিত্র্যই এদেশের ব্যবস্থার বিশিষ্টতা।

একুশ

ডেনমার্কের বয়স্ক-শিক্ষা

ডেনমার্কের বয়স্ক-শিক্ষার ব্যবস্থা বিচিত্র এবং ব্যাপক। এজন্য রয়েছে বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠান, আর তাতে শিক্ষালাভ করছে দেশের শতকরা আট থেকে দশজন লোক। চৌদ্দ-পনের বছর বয়সেই অনেক বালক-বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ করে। তখন এরা বিভিন্ন শিল্পে, বাণিজ্যে বা কৃষিতে শিক্ষানবিশী শুরু করে। এদের তখন স্বাভাবিক অবস্থায় লেখাপড়ার চর্চা বন্ধ হয়ে যায়। চর্চার অভাবে অর্জিত বিদ্যা কেবল অকেজো হবার নয়, লোপ পাবারও সম্ভাবনা দেখা দেয়। তা ছাড়া এরা তো এ বয়সে কৃষ্টিমূলক শিক্ষা পেল না এতটুকু। দেশের সুষ্ঠু নাগরিক হয়ে নিজের মানসিক আর নৈতিক উন্নতিবিধান করার অধিকার তো এদেরও রয়েছে। চর্চার জন্য, কৃষ্টিমূলক শিক্ষার জন্য, আর অধিকতর জ্ঞানলাভের জন্য তাই এদেশের লোকেরা করেছে বয়স্ক-শিক্ষার উদার ব্যবস্থা। আমাদের দেশে বয়স্ক-শিক্ষা বলতে আজও আমরা বুঝি অনেক ক্ষেত্রে নিরক্ষরকে সাক্ষর করে তোলা। তারপর সম্ভাব্য ক্ষেত্রে তাদের সাক্ষরতাকে কায়েম করার ব্যবস্থা। ডেনমার্কে নিরক্ষরতার বালাই নেই। অর্জিত বিদ্যার সংরক্ষণ ও এর পরিবর্ধনই হলো এদের বয়স্ক-শিক্ষার কাজ। এদের বয়স্ক-শিক্ষা বেশীর ভাগ কৃষ্টিমূলক, কিছুটা ব্যবহারিক।

বয়স্ক-শিক্ষার জন্য ডেনমার্কে যে'সকল প্রতিষ্ঠান রয়েছে তাদের মধ্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে এদেশের উচ্চ গণবিদ্যালয় (Folk High School)। এ ধরনের বিদ্যালয়ের সংখ্যা হল এখন মোট পঞ্চান্ন। বছরে ছ' থেকে সাত হাজার ছাত্রছাত্রী উচ্চ গণবিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করে। বহু অর্থব্যয় করে এসকল বিদ্যালয়ের গৃহ নির্মাণ করা হয়েছে। এগুলোর পরিবেশও বেশ মনোরম। উচ্চ গণবিদ্যালয়

আবাসিক। কাজেই বিদ্যালয়গৃহের সঙ্গে ছাত্রাবাসের ব্যবস্থা রাখতে হয়। এ শিক্ষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল ছাত্র-শিক্ষকের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য। কাজেই শিক্ষকের আবাসও তৈরি করতে হয় বিদ্যালয়ের খুব কাছাকাছি। প্রার্থনাকক্ষ, পাঠাগার, ব্যায়ামাগার, শৌচাগার প্রভৃতির ব্যবস্থা অপরিহার্য।

উচ্চ গণবিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য কোন ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতার নির্দেশ নেই। আঠার থেকে পঁচিশ বছরের যুবক-যুবতীদের ভর্তি করা হয় এ বিদ্যালয়ে। এ বয়সটাকে কেন এ শিক্ষার উপযোগী বলে মনে করা হয়, সে প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়, কৃষ্টিমূলক শিক্ষার সাহায্যে অতি অল্প সময়ের মধ্যে একটা আবেগময় জাগরণের সৃষ্টি করাই হলো এ শিক্ষার উদ্দেশ্য। এ বয়সটা আবেগপ্রধান। কাজেই আবেগকে জাগ্রত করার কাজে এ বয়সে বেগ পেতে হয় না বেশী। শুধু আবেগকে বাঞ্ছিত খাতে টেনে নিতে পারলেই উদ্দেশ্য সফল হয়। মনোবিজ্ঞানীরা বলেন—বাল্যে যে বিদ্যা আয়ত্ত করা যায় দু' বছরে, এ বয়সে সে বিদ্যা আয়ত্ত করা যায় চার মাসে। শিক্ষার কাজ দ্রুত অগ্রসর করিয়ে দেবার সহায়তা করে জীবনের অভিজ্ঞতা আর মনের আগ্রহ। শিশু প্রাকৃতিক দুর্যোগের বর্ণনা আয়ত্ত করে অনিচ্ছায়। উপলব্ধির সহায়তা করার জন্য তার নেই জীবনের অভিজ্ঞতা। কিন্তু যুবক-যুবতীর প্রাকৃতিক দুর্যোগের অভিজ্ঞতা রয়েছে প্রচুর, তাদের মনে রয়েছে শিক্ষার আগ্রহ। ফলে বর্ণনা তাদের কাছে হয়ে উঠে জীবন্ত। তাই সে বর্ণনা তারা আয়ত্ত করে অতি সহজে। এ ভাবে প্রায় সকল বস্তুই তারা আয়ত্ত করে অল্প সময়ে। কারণ তাদের সাহায্য করার জন্য রয়েছে জীবনের অভিজ্ঞতা আর শিক্ষার আগ্রহ।

উচ্চ গণবিদ্যালয়ের শিক্ষার প্রধান উপকরণ হল আবেগময়ী বাণী বা 'Living Word'। শিক্ষকের প্রেরণাময়ী বাণী ছাত্রছাত্রীর মনে আবেগের সঞ্চার করে। পরস্পরের মধ্যে সংস্থাপিত হয় একটা অদৃশ্য যোগাযোগ। শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব প্রভাব বিস্তার করে ছাত্রছাত্রীর

মনে। জ্ঞাতসারে হোক বা অজ্ঞাতসারে হোক তাদের মনে নিজের, দশের এবং দেশের মঙ্গলসাধনের প্রবল আগ্রহ জাগে। ধীরে ধীরে এ আগ্রহ স্থায়ীভাবে মনে আসর জমিয়ে বসে। এসকল বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধুর অথচ দৃঢ় ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হতে হয়। বাগ্মিতারও প্রয়োজন তাদের অনেকখানি। আবেগ সৃষ্টি করে তাকে বাঞ্ছিত খাতে প্রবাহিত করাবার ক্ষমতা এদেব থাকা চাই প্রচুর।

এসকল বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচীতে স্থান পেয়েছে সঙ্গীত, সাহিত্য, ইতিহাস, চলতি সংবাদ, শরীরচর্চা প্রভৃতি বিষয়। এতে পাঠাগার অপরিহার্য, আর পাঠচক্রের ব্যবস্থা পর্যাপ্ত। নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা এবং বিতর্কের অবকাশ পায় ছাত্রছাত্রীরা প্রচুর। এতে এদের নিজেদের কৃষ্টির জন্য, ধর্মের জন্য প্রবল অনুরাগ সৃষ্টি হয়। পাঠ্যসূচীতে সঙ্গীতের প্রাধান্য লক্ষ্য করার বিষয়। জাতীয় ঐক্যবোধকে সজাগ রাখবার একটা প্রকৃষ্ট উপায় হিসেবে সঙ্গীতের স্থান খুব বিশিষ্ট। দেহচর্চার ফলে যে স্বাস্থ্য তারা অর্জন করে তাও জাতির সম্পদ।

বছরে দু'বার করে ভর্তি করা হয় ছাত্রছাত্রীদের এই উচ্চ গণ-বিদ্যালয়ে। শীতের সময় যারা ভর্তি হয় তারা শিক্ষা লাভ করে পাঁচ মাস। এ সময় কোন কোন বিদ্যালয়ে সহশিক্ষার ব্যবস্থা থাকে। গ্রীষ্মের সময় যারা ভর্তি হয় তারা শিক্ষালাভ করে তিন মাস। এ সময় প্রায় সকল বিদ্যালয়েই ভর্তি করা হয় কেবল মেয়েদের। ডেনমার্কের আস্কভ (Askov) নামক স্থানে যে বিদ্যালয় রয়েছে সেটা বেশ উন্নত ধরনের। এ প্রতিষ্ঠানকে এদেশে গণবিশ্ববিদ্যালয় বলে সম্মান দেওয়া হয়। এখানে ছাত্রছাত্রীরা ইচ্ছা করলে পর পর তিনবার ভর্তি হয়ে উত্তরোত্তর উন্নত ধরনের পাঠ গ্রহণ করতে পারে।

ছাত্রছাত্রীরা নিজেরাই আপন আপন আহারের ব্যয়ভার বহন করে, আর বিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট বেতন দেয়। অবশ্য অপেক্ষাকৃত দরিদ্র ছাত্রছাত্রীর জন্য সরকারী বৃত্তির ব্যবস্থা রয়েছে। দেশের সরকার

শিক্ষকদের বেতনের অর্ধেক বহন করে। বাকি অর্ধেক আসে ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে আদায়ীকৃত বেতন হ'তে। এ ধরণের বিদ্যালয় একটা ব্যয়সাধ্য প্রতিষ্ঠান, সরকার গৃহ নির্মাণের জন্য অল্পসুদে দীর্ঘমেয়াদী ঋণ দান করে। এরূপ বিদ্যালয়কে গৃহনির্মাণের মোট ব্যয়ের শতকরা তিনভাগ প্রতি বছর সরকারী সাহায্য হিসাবে দেওয়া হয়। সরকারের দিক থেকে কাজেই এ সকল প্রতিষ্ঠানের আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য বিধানে চেষ্টার অভাব নেই।

উচ্চ গণ-বিদ্যালয়ে শিক্ষান্তে কোন পরীক্ষার ব্যবস্থা নেই। শিক্ষাদান পদ্ধতিতে শিক্ষকদের স্বাধীনতা রয়েছে। শিক্ষকদের বাগ্মিতা আর ব্যক্তিত্ব গণবিদ্যালয়ের শিক্ষার কাজে অত্যন্ত অপরিহার্য। বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ নিয়োগ সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষ। অধ্যক্ষ নিজ পছন্দমত অন্য শিক্ষক নিযুক্ত করেন।

ইংলণ্ডের রাজনীতি ক্ষেত্রে পাবলিক স্কুলের প্রাক্তন ছাত্রদের প্রাধান্য খুব বেশী। আর ডেনমার্কের রাজনীতি, সমবায়, কৃষি, প্রভৃতি ক্ষেত্রে উচ্চ গণবিদ্যালয়ের ছাত্রদের প্রাধান্য লক্ষিত হয় সেইরূপ। এদের মধ্য থেকে বেরিয়েছে ডেনমার্কের অনেক দেশ-নেতা, অনেক শাসন-কর্তা আর অনেক সমবায় সমিতির পরিচালক। নানা ক্ষেত্রে উচ্চ গণ-বিদ্যালয়ের দানের বিশিষ্টতা সবাই স্বীকার করে।

উচ্চ গণ-বিদ্যালয় সম্বন্ধে আলোচনা অসম্পূর্ণ থাকে, যদি সে প্রসঙ্গে তার জনক গ্রুণ্ডভিকের (Grundtvig) নাম না করা হয়। এই ধর্মযাজক দার্শনিক কবি ডেনমার্কের রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক দুর্দিনে এই উচ্চ গণ-বিদ্যালয় স্থাপনের সঙ্কল্প করেন। তাঁর এই সঙ্কল্পকে তিনি রূপ দেন ক্রিশ্চেন কোণ্ড প্রভৃতি নিষ্ঠাবান কর্মীর সাহায্যে। এর ফলেই ডেনমার্কের সে সময়কার রাজনৈতিক এবং অর্থ নৈতিক দুর্দিনের অবসান হয়। ভারতে মহাত্মা গান্ধী যেমন জাতির জনক ব'লে অভিহিত হন, ডেনমার্কেও গ্রুণ্ডভিক তেমন ডেনিস জাতির জনক বলেই অভিহিত হন।

আর এক ধরণের বয়স্ক-শিক্ষার প্রতিষ্ঠান হল সান্ধ্য বিদ্যালয়। এ প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থা ব্যাপক। বছরে ন্যূনাধিক তিনলক্ষ ডেনমার্ক-বাসী এতে শিক্ষালাভ করে। চৌদ্দ বছর বয়সের উর্ধ্বে সকল নর-নারী বালক-বালিকা এতে পাঠ গ্রহণ করতে পারে। সাহিত্য, ইতিহাস, বিদেশী ভাষা প্রভৃতি বিদ্যালয়-পাঠ্য বিষয় ছাড়া বাগানের কাজ, কাঠের কাজ, সূঁচের কাজ, ঘরকরণার কাজ প্রভৃতি কোন একটি বা দুটি বিষয়ে শিক্ষাদান করা হয় এই সান্ধ্য বিদ্যালয়ে। নাগরিক শিক্ষা, বিভিন্ন কলকব্জা সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞানদানও এসকল বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত আছে। প্রত্যেক সান্ধ্য বিদ্যালয়ে অন্তত দশজন করে ছাত্রছাত্রীকে হাজির থাকতে হয়। আর প্রত্যেক বিষয়ে অন্ততঃ বিশটি করে বক্তৃতার ব্যবস্থা করতে হয়। প্রত্যেক বিষয়ে অন্তত: সপ্তাহে দু'বার কি তিনবার করে অধিবেশনের ব্যবস্থা করতে হয়। প্রত্যেক ঘণ্টা পাঠদানের জন্য শিক্ষককে নির্দিষ্ট হারে পারিশ্রমিক দিতে হয়। এই পারিশ্রমিকের শতকরা তেত্রিশ ভাগ দেয় স্থানীয় পৌর-প্রতিষ্ঠান আর অবশিষ্ট অংশ দেয় সরকার। ছাত্রছাত্রীদের বেতন দিতে হয় না। ভর্তির সময় সামান্য ভর্তির মাসুল মাত্র দিতে হয়।

যেমন গ্রামাঞ্চলে তেমন সহরে সমানভাবে এই সান্ধ্য বিদ্যালয় গড়ে উঠেছে। হয়ত স্থানীয় প্রাথমিক বা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বা স্থানীয় যুবসংঘ অথবা মহিলা-সংঘ এগুলো স্থাপন করছে। স্থানীয় পৌর প্রতিষ্ঠান এগুলোর জন্য গৃহের ব্যবস্থা ক'রে দেয়। এখানেও পাঠান্তে কোন পরীক্ষার ব্যবস্থা নেই।

এ ছাড়া আবার আর এক ধরণের বয়স্ক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে—যার নাম হল বিদ্যালয়োত্তর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। এখানে শিক্ষালাভ করে তারা, যারা প্রাথমিকোত্তর বিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে এসেছে এবং যাদের বয়স চৌদ্দ থেকে আঠার বছর। এ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলো আবাসিক। আহার, বাসস্থান এবং শিক্ষার ব্যয়ভার বহন করে

ছাত্রছাত্রীরা। অবশ্য সরকার থেকে মোট ব্যয়ের এক-তৃতীয়াংশ দেওয়া হয় সাহায্যরূপে। তা ছাড়া সরকার শিক্ষকদের বেতনের অর্ধেক এবং আনুষঙ্গিক ব্যয়ের অংশ-বিশেষ বহন করে থাকে। গৃহনির্মাণের জন্যও অল্প সুদে দীর্ঘমেয়াদী ঋণের ব্যবস্থা রয়েছে।

সাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি সাধারণ বিদ্যালয়-পাঠ্য বিষয়গুলো ছাড়া কাঠের কাজ, সুঁচের কাজ, ঘরকরণার কাজ, বুননের কাজ প্রভৃতি ব্যবহারিক বিষয়গুলো শিক্ষা দেওয়া হয় এসকল বিদ্যালয়ে। বিভিন্ন দিক থেকে দেখতে গেলে দেখা যায়, এ বিদ্যালয়গুলো উচ্চ গণ-বিদ্যালয়েরই মত। পার্থক্য হল—এখানে ছাত্রছাত্রীর বয়স হল চৌদ্দ থেকে আঠার বছর, আর উচ্চ গণ-বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীর বয়স হল আঠার থেকে পঁচিশ বছর। চৌদ্দ থেকে আঠার এই বয়সটা একটু সঙ্কটময়। তাই শিক্ষকদের দায়িত্ব এখানে একটু বেশী। এ শ্রেণীর বয়স্ক-শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা আজকাল ডেনমার্কে দাঁড়িয়েছে পঁচাত্তর। ছাত্রসংখ্যা হয়েছে পাঁচ হাজার। এখানেও পড়ান হয় শীতকালে পাঁচ মাস, আর গ্রীষ্মকালে তিন মাস।

অন্য এক ধরনের বয়স্ক-বিদ্যালয় রয়েছে যাদের বলা যেতে পারে কৃষিবিদ্যালয়। উচ্চ গণ-বিদ্যালয়ের মত এগুলোতে ভর্তি হয় আঠার থেকে পঁচিশ বছরের যুবক-যুবতী—বিশেষত যারা এগারোত্তর বয়সে পরীক্ষাবিহীন শ্রেণীতে শিক্ষালাভ করেছে। এগুলোও আবাসিক। এ ধরনের সাতাশটি বিদ্যালয় রয়েছে আজকাল ডেনমার্কে। শিক্ষাদান-কালও উচ্চ গণবিদ্যালয়ের মত, শীতকালে পাঁচ মাস আর গ্রীষ্মকালে তিন মাস। গ্রীষ্মকালে ভর্তি করা হয় মেয়েদের এবং শিক্ষাদান চলে উচ্চ গণ-বিদ্যালয়ের রীতিতে। ছেলেদের বেলাও কৃষির বিভিন্ন বিষয় ছাড়া সাহিত্য, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ে কিছুটা শিক্ষাদান করা হয়।

আবার কৃষি সম্বন্ধে শিক্ষাদানের জন্য সান্ধ্য-বিদ্যালয়েরও ব্যবস্থা রয়েছে। এতে যারা শিক্ষালাভ করে তারা দিনের বেলা আপন

আপন ক্ষেত-খামারে কাজ করে। বিকেল বা সন্ধ্যায় মিলিত হয়ে কৃষি সম্বন্ধে পাঠগ্রহণ করে। এ ধরনের রয়েছে প্রায় তিনশ' প্রতিষ্ঠান এবং এগুলোর শিক্ষার্থীর সংখ্যা হল প্রায় ন' হাজার।

বয়স্ক-শিক্ষার জন্য রয়েছে আর এক রকমের প্রতিষ্ঠান—যার নাম দেওয়া যেতে পারে গৃহকর্ম-কলেজ। এখানে বছরে দুবার করে মেয়েদের গৃহকর্ম শিক্ষা দেওয়া হয়। তার সঙ্গে মেয়েরা সাধারণ শিক্ষাও লাভ করে। এগুলোও আবাসিক আর এখানকার ব্যবস্থাও উচ্চ গণ-বিদ্যালয়েরই অনুরূপ। পার্থক্য হল, এখানে জোর দেওয়া হয় ঘরকরনার বিষয়ের উপর একটু বেশী। এরকম প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা হল চৌত্রিশ, আর এতে বছরে শিক্ষালাভ করে তিন হাজার ছাত্রী।

ডেনমার্কের প্রত্যেক স্তরের শিক্ষাব্যবস্থাই অত্যন্ত ব্যাপক এবং বিচিত্র। শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবার মত দুর্ভাগ্য এখানে কারও ঘটে নি। বিভিন্ন বয়সের উপযোগী শিক্ষার সুযোগ যেমন রয়েছে, বিভিন্ন মানসিক শক্তির উপযোগী শিক্ষার ব্যবস্থাও রয়েছে তেমন। শিক্ষা সর্বক্ষেত্রেই পূর্ণ ফলপ্রসূ। শিক্ষান্তে বহুক্ষেত্রে আমাদের দেশে যুবক-যুবতীর ভাগ্যে যে বিড়ম্বনা আসে তার হাত থেকে এখানকার যুবক-যুবতীরা মুক্তি পেয়েছে। যে উদ্দেশ্য নিয়ে ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষালাভ করতে এগিয়ে যায়, শিক্ষান্তে তারা দেখে তাদের সে উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। জীবন তাদের সার্থক হয়েছে।

বাইশ

বিভিন্ন মতে সমাজশিক্ষা

অন্যান্য নানা বিষয়েরই মত সমাজশিক্ষাকে নানা পণ্ডিত নানা ভাবে দেখেছেন। ফলে সমাজশিক্ষার পৃথক পৃথক সংজ্ঞা বিধৃত হয়েছে, আলাদা আলাদা উদ্দেশ্য নির্দিষ্ট হয়েছে এবং নানা ধরনের কর্মসূচীকে সমাজশিক্ষার অন্তর্ভুক্তির সুপারিশ করা হয়েছে। কিন্তু প্রায় ক্ষেত্রেই দেখা যায় পার্থক্য বহিরাবরণগত, মূলগত নয়। প্রায় সকল পার্থক্যেরই মূলে রয়েছে হয়ত দৃষ্টি-ভঙ্গির বিভিন্নতা। একটু বিশ্লেষণ করলেই আপাত-বিরোধী ধারণাগুলোর মধ্যে আভ্যন্তরীন মিলের সন্ধান পাওয়া যায়।

কোন কোন ক্ষেত্রে সমাজশিক্ষাকে বাঞ্ছনীয় সামাজিক পরিবর্তনের শিক্ষা বলে অভিহিত করা হয়। মানুষের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মতই সমাজ সদা পরিবর্তনশীল। বর্তমান সমাজ নানা কারণে সর্বত্রই অতি দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে। প্রতিটি পরিবর্তন সমাজের তথা ব্যক্তির উপর নিয়ত প্রভাব বিস্তার করছে। কোন কোন পরিবর্তন একেবারে যুগান্তকারী বলে ঘোষিত এবং স্বীকৃত হচ্ছে। এ সকল পরিবর্তন সমাজের রূপ একেবারে বদলে দিচ্ছে। সকল পরিবর্তন বাঞ্ছনীয় হয়ত নয়। কতগুলো অন্ততঃ বাঞ্ছনীয় বলে গৃহীত হয়। সমাজে বাস করতে হলে প্রতিটি ব্যক্তিকে বাঞ্ছনীয় পরিবর্তনের ধারার সঙ্গে পরিচিত হতে হবে, সেগুলোর তাৎপর্য গ্রহণ করতে হবে এবং তার সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে চলতে হবে। কাজেই সামাজিক জীবন যাপনের শিক্ষা নিতে হলেই মানুষকে সামাজিক পরিবর্তনের সম্বন্ধে শিক্ষাও নিতে হয়।

একটু পরীক্ষা করে দেখলেই দেখা যাবে, এ সংজ্ঞার মধ্যে নতুন কোন তথ্যের ইঙ্গিত নেই। নতুন কোন দৃষ্টি-ভঙ্গিও এতে নেই।

কেবল সমাজের পরিবর্তনশীলতার স্বীকৃতি এতে রয়েছে। এই গ্রন্থের প্রথম দিকে সমাজ শিক্ষার যে সংজ্ঞা বিধৃত হয়েছে তার সঙ্গে এই সংজ্ঞার পার্থক্য ভাষাগত, মূলগত নয়। এ গ্রন্থের সংজ্ঞায় সমাজের পরিবর্তনশীলতার স্পষ্ট উল্লেখ নেই। এটা এতো স্পষ্ট সত্য, যে তার উল্লেখের কোন প্রয়োজন বোধ করা হয়নি। এই সংজ্ঞায় সে উল্লেখ রয়েছে। মূলত সমাজের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নেওয়ার শিক্ষাই প্রকৃত সমাজ শিক্ষা একথা উভয় সংজ্ঞাই স্বীকার করছে। যাকে সমাজের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার শিক্ষা নিতে হবে, তাকে সমাজের পরিবর্তন বিশেষ করে বাঞ্ছনীয় পরিবর্তন সম্বন্ধে অবহিত হতেই হবে।

সমাজ শিক্ষা সম্বন্ধে আমাদের দেশে অধুনা প্রচলিত আর একটি সংজ্ঞা হচ্ছে, সমাজ শিক্ষা সমষ্টি উন্নয়নের দায়িত্ব গ্রহণের শিক্ষা সমষ্টির উন্নয়ন সাধিত না হলে ব্যক্তির উন্নতি সম্ভব হয় না। ব্যাপক ভাবে সমষ্টির উন্নয়ন তখনই সম্ভব হয়, যখন সমগ্র জন-সমাজ মিলিত ভাবে সমষ্টি উন্নয়নের দায়িত্ব গ্রহণ করে। বাইরে থেকে কোন শক্তি এ উন্নয়ন সাধনে সম্পূর্ণরূপে সমর্থ হতে পারে না। তাই ব্যক্তিগতভাবে সমাজের সকল লোককে উন্নয়নের তাৎপর্য উপলব্ধি করতে হবে, উন্নয়ন প্রচেষ্টায় সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে হবে। তবেই সমষ্টি উন্নয়ন সম্ভব হবে। সুষ্ঠুভাবে সমাজে বাস করতে হলে মানুষকে সমষ্টি উন্নয়নের শিক্ষা নিতে হয়। অর্থাৎ সুষ্ঠুভাবে সমাজ জীবন যাপনের শিক্ষা নিতে হলেই মানুষকে সমষ্টি উন্নয়নের দায়িত্ব গ্রহণের শিক্ষাও নিতে হয়।

উপরের এই সংজ্ঞাটি পরীক্ষা করলে দেখা যাবে এই সংজ্ঞাও সমাজ শিক্ষাকে সুষ্ঠু সমাজ জীবন যাপনের শিক্ষা বলে স্বীকার করে নিচ্ছে। অবশ্য এ সংজ্ঞা সমাজ শিক্ষার বিভিন্ন কর্মসূচীর মধ্যে নাগরিক শিক্ষার উপরই বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। সুষ্ঠু সমাজ জীবন যাপনের জন্য মানুষকে অবসর বিনোদনের উৎকৃষ্ট উপায়

সম্বন্ধেও শিক্ষা নিতে হয়। নিজের অর্থনৈতিক জীবনের উন্নতি সাধনের উপায় জানতে হয়। এই সংজ্ঞাটি প্রত্যক্ষভাবে এধরনের কর্মসূচীকে সমাজ শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত করেনি। অবশ্য এগুলোর সামাজিক দিক বিচার করলে দেখা যাবে, পরোক্ষভাবে এগুলোও নাগরিক শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত। কাজেই গুরুত্ব আরোপণের ব্যাপারে এই সংজ্ঞার সঙ্গে এই গ্রন্থের সংজ্ঞার সামান্য পার্থক্য থাকলেও মূলত এই দুই সংজ্ঞার মধ্যে পার্থক্য নেই।

সমাজ শিক্ষার অধুনা প্রচলিত আর একটি সংজ্ঞা হলো সমষ্টি গঠনের মাধ্যমে সমষ্টিগত জীবন যাপনের শিক্ষা। এই সংজ্ঞাটিতে সমাজশিক্ষার উদ্দেশ্য এবং উপায় এই উভয়েরই উল্লেখ রয়েছে। উদ্দেশ্য হিসাবে বলা হয়েছে, সমাজশিক্ষা মানুষকে সমষ্টি-জীবন যাপনের উপযোগী করে তোলার শিক্ষা। এই পর্যন্ত এই গ্রন্থে বিধৃত সংজ্ঞার সঙ্গে এই সংজ্ঞার কেবল ভাবগত নয় ভাষাগতও সম্পূর্ণ মিল রয়েছে। কিন্তু এই সংজ্ঞাতে কেবল নানা ধরনের সঙ্ঘ যেমন যুবক-দল, মহিলা-সমিতি, বালক-দল, সমবায় সমিতি প্রভৃতি গড়ে তোলা এবং সেগুলোর কাজে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করাকেই বলা হচ্ছে সমাজশিক্ষা লাভের উপায়। ব্যবহারিক শিক্ষাই যে সকল শিক্ষার শ্রেষ্ঠ উপায় সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। কিন্তু পুঁথিগত শিক্ষারও যে প্রয়োজন আছে সে কথা এ সংজ্ঞায় পূর্ণ স্বীকৃতি লাভ করেনি। আলাপ, আলোচনা, বক্তৃতা শ্রব্যদৃশ্য সহায়কের সাহায্য গ্রহণ প্রভৃতি সমাজ শিক্ষার বা অন্য ধরনের সকল শিক্ষারই সহায়ক সে কথা এ সংজ্ঞায় স্বীকৃতি পায়নি। এই হিসেবে এই সংজ্ঞাটি এই গ্রন্থে বিধৃত সংজ্ঞা থেকে মনে হয় পৃথক। কিন্তু যদি একথা মনে করা যায় যে সকল ব্যবহারিক শিক্ষা তখনই সুসম্পন্ন হয় যখন তার সঙ্গে পূর্বে বা পরে পুঁথিগত শিক্ষা যুক্ত থাকে, তবেই দেখা যায় এই সংজ্ঞার সঙ্গে এই গ্রন্থে প্রদত্ত একমাত্র সংজ্ঞার মূলগত পার্থক্য নেই। প্রথম সংজ্ঞাটি অপেক্ষা দ্বিতীয় সংজ্ঞা অধিকতর ব্যাপক।

কোন কোন ক্ষেত্রে সমাজশিক্ষাকে বয়স্ক-শিক্ষা বলেই সংজ্ঞিত করা হয়। সমাজশিক্ষার ইতিহাস, বিশেষ করে আমাদের দেশের সমাজশিক্ষার স্বল্পকালীন ইতিহাস, আলোচনা করলে দেখা যায় এক সময়ে যাকে বয়স্ক-শিক্ষা বলে গ্রহণ করা হয়েছিল পরবর্তীকালে অবস্থার প্রয়োজনে তাকেই সমাজশিক্ষা বলে গ্রহণ করা হলো। কর্মসূচীকে পরিবর্তিত এবং পরিবর্ধিত করতে হয়েছিল বলেই নতুন নামকরণ করা হলো। পরবর্তীকালে প্রচলিত শিক্ষাকে বয়স্ক-শিক্ষা নাম দিলে সে নাম পূর্ণার্থজ্ঞাপক হত না বলেই নতুন নামের প্রয়োজন হলো। এ থেকেই বুঝা যায় সমাজ শিক্ষা আর বয়স্ক-শিক্ষা এক নয়। প্রায় সমার্থবোধক হলেও এ দু'টোর মধ্যে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে।

এই গ্রন্থে সমাজশিক্ষা বনাম বয়স্ক-শিক্ষা প্রবন্ধে এ সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে সমাজশিক্ষা আবাল বৃদ্ধ বণিতার জন্য, আর বয়স্ক শিক্ষা কেবল বয়স্কদের জন্য। আবার বিদেশী ভাষা শিক্ষাও বয়স্ক-শিক্ষার অন্তর্গত হতে পারে। কিন্তু সমাজ শিক্ষার সঙ্গে তার প্রত্যক্ষ যোগ বড় একটা নেই। এ ধরণের ছোট-খাট পার্থক্য ছাড়া বয়স্ক-শিক্ষা এবং সমাজশিক্ষার মধ্যে পার্থক্য বিশেষ কিছু নেই। অবস্থার প্রয়োজনে বয়স্ক-শিক্ষার নবরূপায়ণই হলো সমাজ শিক্ষা।

একথা সকল সময়েই স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে দেশ-কাল-পাত্র ভেদে একই বস্তুর বিভিন্ন নাম হতে পারে। একই বস্তুর উপাদানেও সামান্য তারতম্য থাকতে পারে। বাস্তবিক সমাজশিক্ষার কয়েকটি সংজ্ঞার আলোচনা থেকে একথা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, এগুলোর মধ্যে মূলগত পার্থক্য নেই। বিভিন্ন ভাবে একই কথাকে প্রকাশ করা হয়েছে। কোথাও দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যের জন্য, কোথাও গুরুত্ব আরোপণের তারতম্যের জন্য সংজ্ঞায় সামান্য পার্থক্য দেখা দিয়েছে।